অনুপ্রাস

অনুপ্রাস

ভবেশ চক্রবর্ত্তী

—পরিবেশক—

শোভনা প্রকাশনী

১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট

প্রকাশিকা :
দীপালী চক্রবর্ত্তী
১১।৬, বেলেঘাটা মেন রোড
কলিকাতা-১০

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৬৫

প্রচ্ছদপট :
অমূল্য দাস

এক টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা

ব্লক :
ষ্টাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং

মুদ্রাকর :
শ্রীশ্যামসুন্দর ঘোষ
ঘোষ আর্ট প্রেস
১৩৫এ, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট

মায়ের পায়ে

এই লেখকের

পথ—একাঙ্ক নাটক

বাঁশি—উপন্যাস (যন্ত্রস্থ)

ঘরে ঘরে উপাসনা আর আরাধনা করা হয় লক্ষ্মীর, আর অযাচিত কৃপা করেন—মা ষষ্ঠী।

বিমলাচরণ ছিলেন এ প্রবাদ বাক্যের ব্যতিক্রম। লক্ষ্মীদেবী খুব একটা সুনজর দিন আর না দিন, ষষ্ঠীদেবীও তেমন সুবিধে করতে পারেন নি—তাঁর ঘরে। ব্যাঙ্কের চাকরী—একটি ছেলে—আর একটি মেয়ে নিয়েই পরিতৃপ্ত ছিলেন—তিনি আর তাঁর স্ত্রী। বেঁচে-বর্তে থাকলে এদুটিকে মনের মত করে গড়ে রেখে যাবেন এই ছিল তাঁদের আশা। কিন্তু আশা আসলে রূপায়িত করা সম্ভব হয় কজনের পক্ষে? হল না বিমলাচরণের জীবনে। চাকরি শেষ হতে না হতেই বর্তমান হয়ে গেল অতীত। ভবিষ্যত থেকে গেল শূন্যে—মহাশূন্যে।

থাকলেন, বিধবা স্ত্রী। থাকল ছেলে অশেষ ও মেয়ে সুপ্তি। আর থাকল, আজীবনের সঞ্চয় হাজার পাঁচেক টাকা ব্যাঙ্কে। আর পাঁচ হাজারের ইন্‌সিওরেন্স।

উপার্জন করার উপযুক্ত হয়ত হয়েছে অশেষ। আই, এ পাশ করেছে। বয়সও বছর উনিশ। কিন্তু উপার্জন নেই একটি আধলাও। মায়ের ইচ্ছা, অন্ততঃ বি-এটা তাকে পাশ করতেই হবে। কিন্তু পড়াশুনা আজ আর ভাল লাগে না ওর। ও ভাবে—শুধু ভাবে। বাবার যা কিছু সঞ্চয় সে নষ্ট করে দেবে? মাইনে দিতে হবে না সুপ্তির স্কুলের? বিয়ে দিতে হবে না ওর? একটা ডিগ্রী না পেলে এমন কি ক্ষতি হয় তার? কিন্তু বোনের লেখাপড়া? বোনের বিয়ে?

এমনিতর কত ভাবনা সে ভাবে। ভাবুক। দশ বারো থেকে দুর্ভাবনা ভাবতে অভ্যস্ত তো বাংলার ছেলেরা। অশেষ ভাগ্যবান এদিক থেকে। তার ভাবনা তো সুরু হয়েছে এদের তুলনায় অনেক পরে। রুগ্ন বৃদ্ধ একটা বাপ নেই ঘরে, বিধবা বোন টি-বি নিয়ে এসে হাজির হয়নি তার দরজায়, একদল ছোট ভাইবোন লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নেই তার মুখের দিকে। তবে? আছে শুধু একটি বোন। তার লেখাপড়া তার বিয়ে, এইতো? উম, একি আর একটা ভাবনা! অশেষ তো ছেলেমানুষ তার সমবয়সী বন্ধুদের কাছে। তবে একটা কথা। যার মাথা তারি ব্যথা, এটা সত্যি।

সর্দি-জ্বরে আর মাথাব্যথায় মনে হয় এর চেয়ে কষ্ট বুঝি আর কিছু নেই? কিন্তু কলেরা? টাইফয়েড—টি, বি? এরাও তো রয়েছে ডাক্তারের ডিক্‌শনারীতে। তাই অশেষের কাছে এটাই বড়, সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনা।

মা, পড়াশুনো আমি আর করব না।

কলেজফেরতা ক্লান্ত অশেষ বইগুলো রাখল তার টেবিলের উপর।

সে কিরে, আর একটা বছর বৈতো নয়! ও ঠিক চলে যাবেখন। মা ছেলের মাথায় হাওয়া দিতে আরম্ভ করলেন তাঁর তালপাতার পাখাখানা দিয়ে।

তারপর কত কথা হল মায়েতে ছেলেতে। ব্যাঙ্ক থেকে মাসে দেড়শ টাকার বেশি তোলা হয় না সংসার খরচার জন্যে। তিরিশ টাকার ঘর ভাড়া। এক'শ কুড়ি টাকায় সব চালিয়ে নেন তিনি। ছেলের পরীক্ষা হয়ে ফল বেরুতে বেরুতে প্রায় দুবছর, হাজার তিনেক টাকাই খরচা হোক তাঁর। তারপর আর একটি পয়সাও তিনি তুলবেন না ব্যাঙ্ক থেকে। ছেলের রোজগারে সংসার চলবে, সঞ্চিত টাকা ব্যয় হবে মেয়ের বিয়েতে।

অকাট্য যুক্তি। এরপরে আর কোন কথা চলে না অশেষের। তবু সে জোর করে।

চল না মা, কম ভাড়ায় অন্য কোন ঘরে আমরা উঠে যাই। আর এতো ভাল বাড়ি, দুখানা ঘর, এ আমাদের দরকার কি?

এ প্রস্তাব নাকচ করতে পারলেন না মা। ছেলে যে ঘরে নিয়ে যাবে মা সেই ঘরেই যাবেন। আর ছেলে 'পড়ব না' কথাটি মুখে আনতে পারবে না কোনদিন। এই রায় হল বিচারে। এ বাড়িতে এ ধরনের কোর্টের বিচারক—লেডী জাজ্ ষোল বছরের কুমারী স্বপ্তি।

রায় পালিত হল অক্ষরে অক্ষরে। মা নিঃশব্দে উঠে এলেন বারো টাকার ঘরে। বস্তিতে। ছেলে মেয়েই যদি থাকতে পারে তা হলে তাঁর আর আপত্তি কি? মাসে আঠারো টাকা করে কম তুললেই চলবে এখন থেকে। অশেষও সেদিন থেকে কলেজ করছে নিয়মমত। আর ক্লাশ নাইন অবধি পড়েই বইয়ের পাতা চিরকালের মত বন্ধ করতে হল স্বপ্তির। সে নিয়েছে রান্নাবান্না সেলাই-ফোঁড়াইয়ের ভার।

বয়সটা কম হলেও ঘরকন্নার কাজে স্বপ্তির জুড়ি নেই এ বস্তিতে। আর সবাই কানাঘুষো করে ওর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজকর্মের কথা তুলে। কৈ, ওদের রান্নার দাওয়াটা ঘুঁটে উনুনের ছাই'এ নোংরা হয়ে থাকে না তো। ঘরময় ঝুল নোংরা ছেঁড়া কাপড়-চোপড় এখানে সেখানে পড়ে থাকে না তো একটিও। কেমন সুন্দর ফিট্-ফাট্ টিপ্‌টাপ্ ওর কাজ। ওর ভাইটা বেলাশেষে বা রাতদুপুরে নেশা করে আসে না ঘরে। মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া করে না গলা উঁচু করে। ঘরের কাজ? সব একাইতো করে স্বপ্তি। মাকে কুটোটি নাড়তে দেয় না কোনদিন। ওরা ভদ্রলোক। শিক্ষিত।

বিপদে পড়ে এসেছে এখানে। এমন নোংরা বস্তিতে। তাই বলে গরিমাও ওদের নেই এতটুকু। সবার সঙ্গে মেশে। হাসে। কথা কয়।

ঐ তো ও ঘরের বারো বছরের মা-মরা ছেলে তিলুটা একদিনও পেট পুরে খেতে পেত না এর আগে। সদ্‌মায়ের অসদ্‌ব্যবহার, গালাগালি। তার ওপরে মাতাল বাপের মারধোর। এ তো লেগেই থাকতো রোজ। স্বপ্তিরা এসে বাঁচিয়ে দিয়েছে ছেলেটাকে। বেঁচে গেছে ওর সৎমা আর বেঁহুস্ বাপ, বেঁচে গেছে দুবেলা থালায় থালায় গিলোবার দায়িত্ব থেকে। তিলু ঠাকুমা কাকামণি আর পিসিমণি বলে ডাকে ওদের। ওদেরও মায়া পড়ে গেছে খুব। ছ'মাস তো হ'ল, কিন্তু কিছুতেই স্কুলে ভর্তি হল না তিলু। বিড়ির কাজ শিখতে লেগে গেছে, ওদের ঘরে খায়, থাকতে চায় ওদের চাকরের মত। এক রত্তি বস্তির ছেলে, স্নেহ চায় না, চায় করুণা। বড় হতে চায় না, চায় ছোট হয়ে বাঁচতে। বাইরে থেকে যাঁরা শুধু কদর্যতা কল্পনা করেন বস্তির, ভেতরে এলে তিলুটাকে ডেঁপো বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই তাঁদের। কিন্তু স্বপ্তি-অশেষ ওরা মনে মনে মেনে নিয়েছে ওকে। স্নেহ, একটু হাসি, একটা মিষ্টি কথা, জীবনে যে পায়নি কোনদিন হঠাৎ একদিন এগুলোকে একসঙ্গে পাওয়া তার পক্ষে বড় কম শাস্তি নয়; তাই ওরা ভালবাসে, তবু স্নেহ করে।

তিলুটাও ফাজিল হয়েছে কম নয়। দুষ্টবুদ্ধি এ বয়সেই হয়েছে ষোল আনা। গরমের দুপুরে এদিক সেদিক থেকে একটা কাঁচা আম দুটো কচি শসা এনে দেয় পিসিমণিকে। কাকামণিকে তুষ্ট করে তার গেঞ্জিটা-জামাটায় সাবান দিয়ে কেচে দিয়ে, আর ঠাকুরমার মন জয় করে বসেছে একদিনেই। ঘুরিয়ে এনেছে কালীঘাটের কালীবাড়ি থেকে। আর এখন মাসে একটা দিন শুধু নিয়ে যেতে হয় ব্যাঙ্কে, টাকা তুলবার জন্যে।

সাবানকাচা হাফ্‌প্যাণ্ট আর হাফ্‌সার্ট পরে এসে হাজির হ'ল তিলু।

কৈ, তোমার হয়েছে ঠাকুমা, চল চল। এগারটা বেজে গেল যে।

দুর্গা বলে যাত্রা করলেন ঠাকুমা। আজ এ মাসের টাকা তুলবার দিন তাঁর।

ট্রাম থেকে নেমে ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে চাদরের খুঁট খুলে হাতে করে নিলেন চেকখানা। একটু তাড়াতাড়ি পেয়ে গেলেই হয়। যা ভিড় হয় আজকাল।

ও কি? ব্যাঙ্কের সামনে রাস্তার ফুটপাতে এত লোক হুল্লোড় করছে কেন? মারামারি হয়নি তো? এ কি, ভেতর থেকে তালা বন্ধ ব্যাঙ্কের কোলাপ্‌সিবল্‌ গেটে? সাইন বোর্ড লেখা রয়েছে—Payment closed?

"আমার সর্বনাশ হয়েছে।" "আমার যথাসর্বস্ব" "আমার মেয়ের বিয়ের কি হবে? সব যে এখানে"—এ সব বলে হা-হুতাশ করছে লোকগুলো? মাথা কুটছে? ভগবানকে সাক্ষী মানছে, ধর্মকে ডাকছে?

কিন্তু কোথায় ভগবান? কোথায় ধর্ম? ফুটপাতে আছড়ে-পড়া ওদের ভগবান ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার। পালিয়েছেন পেছনের দরজা দিয়ে। প্রাইভেট গাড়ি করে। এসেছে পুলিশ নিরাপত্তা রক্ষার জন্য। পুলিশ ওদের ধর্ম।

অচৈতন্য মাকে রিক্স থেকে তুলে এনে শুশ্রূষা করল তিনজনে। জ্ঞান ফিরল মার। তাকিয়ে দেখলেন, শুকনো মুখে বসে অশেষ, সুপ্তি আর তিলু। ওদের জন্য কি রইল আর? ঐ ব্যাঙ্কেই ক্যাসিয়ারের কাজ করেছেন বিমলাচরণ, অনেক দিন করেছেন। তাঁর যথাসর্বস্ব ঐখানেই। ইন্‌সিওরের পাঁচ হাজারও জমা পড়েছে ঐখানে। তাঁর যাবতীয় যা কিছু সব ঐ ব্যাঙ্কে। কি হবে? কি করবেন তিনি?

ফাইন খদ্দরের সাদা পাঞ্জাবী, মোটা ফ্রেমের চশমা। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার রায় সাহেবের। বালিগঞ্জের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে বসে বড় ব্যস্ত তিনি। একপাঁজা ফাইল কাগজপত্তর টেবিলের ওপর। একটা জ্বলন্ত সিগারেট মিছামিছি পুড়ে ছাই হয়ে গেল য়্যাস্‌ট্রেটার ওপর অমনি পড়ে থেকে। একটা ফাইলকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলেন টবিলের নিচে। তারপর নিজেকে এলিয়ে দিলেন চেয়ারে। ঠোঁটে সিগারেট জ্বলল আর একটা। ধোঁয়া ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই ঠিক তখনকার মত।

সরু ফ্রেমের চশমা। মাথায় টাক। একখানা ক্লান্তি-দীপ্ত মুখ এসে দাঁড়াল পেছন দিককার জানালায়।

আসব স্যার ?

এপাশ দিয়ে ঘরে এসেছে চাকরটা।

একজন ভদ্রমহিলা আর একটি ছেলে, ডেকে দেব ?

এখন ?···আচ্ছা যা নিয়ে আয়।

প্রতীক্ষার দৃষ্টি নিয়ে জানালায় তখনো দাঁড়িয়ে মুখখানা।

রায় সাহেব জানালেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

সট্‌ করে সরে গেল মৃদু হেসে।

ভৃত্যের সঙ্গে প্রবেশ করলেন একজন বিধবা মহিলা, একটি তরুণ। নমস্কার জানিয়ে পরিচয় দিল তরুণই প্রথম।

আমি বিমলাচরণ বাবুর ছেলে। আর ইনি আমার মা।

বসুন, বসুন।

রায় সাহেব দেখিয়ে দিলেন চেয়ার দুখানা।

বাবার মৃত্যু থেকে ব্যাঙ্ক ফেল পড়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা সবিনয়ে সংক্ষেপে নিবেদন করল অশেষ। নিজে সে বি, এ পড়ছে। এ অবস্থায় তার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবে। বস্তিতে বাস করেও দুবেলা দুমুঠো পাবারও কোন আশা নেই আর, যদি না ওদের গচ্ছিত টাকার কিছুটা অংশ ওরা ফিরে পায়। অন্ততঃ ইন্সিওরেন্সের টাকা। যেটা মা নিজে জমা দিয়েছেন তাঁর একাউন্টে—সেটা পেলেও বেঁচে যায় ওরা। তাই অনুরোধ করল রায় সাহেবকে। ভিক্ষা চাইল তাঁর কাছে। মা চোখের জল ফেল্‌লেন, মিনতি করলেন। নালিশ জানালেন না তাঁর দরবারে। লোক ভাল রায় সাহেব। শুনলেন সব কথা।

আমি বড়ই দুঃখিত। দুদিন আগে যদি অন্ততঃ তোমরা আসতে। আমারও তো যথাসর্বস্ব ঐ ব্যাঙ্কেই ছিল।

রায় সাহেব জানালেন তিনিও বসেছেন পথে। Bad investment—কর্মচারীদের কর্তব্যে অবহেলা, অসাধুতা—এই সমস্ত কারণ দেখালেন ব্যাঙ্ক ফেলের। এখন আর কোন হাত নেই তাঁর। আর একটি পয়সাও নেই হাতে। নয়তো এ দুঃসময়ে বিমলাচরণের স্ত্রী পুত্রকে যেভাবেই হোক আংশিক সাহায্য করতেন তিনি। অন্তর আছে তাঁর, ক্ষমতা নেই।

রায় সাহেব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বল্‌লেন।

যে করেই হোক পড়াশুনাটা চালিয়ে যাও, বি-এ টা পাশ করতেই হবে। তখন একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেব আমি। বিমলাচরণের ছেলে তুমি, তোমার জন্যে কিছু করতে না পেরে সত্যি লজ্জিত আমি।

নিঃশব্দে মাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে অশেষ। অন্তরে উঠেছে ওর তীব্র বিদ্রোহ। জ্বালাময়ী ব্যর্থতার প্রতিহিংসা। ও বলতে চায়, আমাদের টাকা খাটিয়ে এতকাল লাভ করে এসেছ। বড় হয়েছ। বাড়ি গাড়ি তোমার না আছে কি? বিক্রি কর, মর্টগেজ দাও—ফিরিয়ে দাও আমাদের মুখের গ্রাস।

কিন্তু না। অন্তর যাই বলুক না কেন মুখে চোখে ওর লজ্জা, ভয়, ক্ষমা, ত্যাগ। দোকানে সাজানো থাকে অনেক রকমের অনেক খাবার। তার নিচে ফুটপাতে শুয়ে ভিক্ষে করে বাঙালি। তার পাশে অনাহারে আত্মহত্যা করে বাঙালির বউ। সেই দেশের ছেলে অশেষ, সেই দেশের জননী ওর মা। ফিরে যাবে নাতো কি? গেল ফিরে। নিঃশব্দে, নিরবে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন ডিরেক্টর রায়।

কত লোক, কত লোক আর আসবে এমনি করে? আর কজনের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে তাঁর?

আসব স্যার?

আবার সেই মুখখানা জানালায়।

আসুন।

কিছু ভাববেন না স্যার। সব ঠিক হয়ে গেছে। পাকপাড়ার জমি আর তিনতলা বাড়ির প্ল্যান সমস্ত প্রস্তুত। এবার একটা শুভ দিন দেখে কাজটা স্বরু করলেই হল।·····কৈহে, এক গ্লাস জল দাও। আর বুঝলেন স্যার, আপনার ভগ্নিপোত বলে কিনা 'রায় তো বউয়ের নামে পাকপাড়ায় বাড়ি করছে ব্যাঙ্কের টাকা মেরে। দশজনের টাকা।' আমি শুনিয়ে দিয়ে এসেছি মুখের ওপর! শুনিয়ে দিয়েছি, সেরকম লোকই নন্ রায় সাহেব।

ঢক্ ঢক্ করে গিলে ফেল্‌ল এক গ্লাস জল।

বুঝলেন স্যার। আমি বল্লুম, আর যদি মেরেই থাকে তো অন্যায়টা কি হয়েছে শুনি?····· তুমি মারতো দেখি একজনের পাঁচটা টাকা, বুঝব কেরামতি!

কি রে অশেষ, আজ কদিন মুখে কথা নেই? বই নিয়ে বসিস্ না, বাড়ি ফিরিস্ রাত করে। কি হয়েছে তোর?

প্রশ্ন করেন মা।

না, কিছু না।

অশেষ পড়াশুনো ছেড়ে দিলি?…ছাড়িস্ নি বাবা, আমার বড় সাধ। ব্যাঙ্ক ফেল পড়েছে, তার চেয়ে আমার বড় পরাজয় হবে যদি এসময়ে তোর পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু মা,…

অশেষ বলতে চায় কিছু।

কিন্তু বলবে কাকে? বলার আছে অনেক। কিন্তু পুরনো। অতি পুরনো সে সব কথা। অভাব দারিদ্র্য চাকুরি এসব শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে এদেশের লোকের। তবু নূতন করে বোঝাতে চায় মাকে। কিন্তু নাছোড়বান্দা তিনি। পড়তেই হবে অশেষকে। সেকস্‌পীয়র, কীট্‌স্, শেলী, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, মাইকেলকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে ওকে। মুখস্ত করতে হবে Productive আর Unproductive লেবারের থিওরী। জানতে হবে ল্যাণ্ড, লেবার, ক্যাপিটাল, অরগানিজেশন। সংসারের কথাবার্তায় ভাবনা-দুর্ভাবনায় ওর প্রবেশ নিষেধ। প্রবেশ করতে দেবেন না মা।

মা দায়িত্ব নিচ্ছেন এ ছমাসের। নিজের হাতে যা আছে তাতেই মা চালিয়ে দেবেন আরো বছরখানেক। কোন কথা বলতে পারবে না অশেষ। কোন কথা চলবে না যুক্তির। মেনে নিল অশেষ।

না মেনে উপায় কি? মাকে কষ্ট দেওয়া কঠিন নয়, কিন্তু এ জীবনে আর সে তাঁকে সুখ দিতে পারবে কোনদিন? বি, এ পাশ যদি করেও বা, পারবে সে একটা চাকরি জোগাড় করতে? তাই মেনে নেয়। বাধ্য হয়ে স্বীকার করে নেয় ভাগ্যকে। বিশ্বাস করে হাতের রেখায়।

কিন্তু সুপ্তির ভাল লাগে না মায়ের এ জেদ। জেদ? হ্যাঁ, জেদ ছাড়া আর কি? দাদা একটি চাকরি করে যদি ভুলিয়ে দিতে পারতো টাকার শোক, তাহলে এমন কি অন্যায় হত তার? এইতো এক খানা মাত্র শাড়ি তার সম্বল আজ। কাপড় দরকার, সায়া নাই, ব্লাউজ চাই, এসব কথা বলবে সে কাকে? দাদাকে? দাদাতো ব্যস্ত তার পড়ায়। মাকে? কি করে বলবে সে?

মায়ের সামনে এগোতে তার ভরসা হয় না আর। কেমন গম্ভীর, কোন কথা বলেন না কারো সঙ্গে। যেন কত অপরাধ করেছে তারা। কি অপরাধ তাদের? কেন মা কথা বলেন না? পূজা আর আহ্নিক নিয়েই থাকতেন এর আগে, এখন মাঝে মাঝে বেরোন ঘর থেকে। কোথায় কে জানে?

যা একটু ভাব তার তিলুর সঙ্গে। ডাকেন, কথা বলেন চুপি চুপি। যেন কেউ শুনতে না পায় ওরা। তিলু বিড়ির কাজ শেখে! আবার মাকে নিয়ে বেরোয়। কিন্তু ওদের কাছে বলে না কিছু। এতই পর সুপ্তি আর ওর দাদা? যত আপন হল বুঝি পরের ছেলে ঐ তিলু!

একদিন কেচে দিয়েছে ভাল শাড়িখানা। পরেছে দাদার একখানা ছেঁড়া ময়লা ধুতি! স্নান করে পরবে কি? কিছু নেই তো পরার মত। মাও নেই ঘরে, তিলুকে নিয়ে বেরিয়েছেন সেই সকালে!

মায়ের ট্রাঙ্কটা খুলল! যাক আছে! ঐ তো একখানা শাড়ি। তার সব চেয়ে ভাল শাড়ি! পূজোয় পেয়েছিল বাবার কাছ থেকে বছর দুই আগে। বার করে নিল শাড়িখানা।

মা বাড়ি ফিরলেন সেদিন সেই বিকেলে। কি রাখবেন বাক্সে চাদরের খুঁট থেকে। ট্রাঙ্কের ডালা খুলেই রাগে ফেটে পড়লেন তিনি।

স্বপ্তি, স্বপ্তি।

যাই মা।

এস ঘরে।

বাক্স খুলেছে কে আমার ?

আমি শাড়ি বার করে নিয়েছি একখানা।

আমাকে বললেই পারতিস্। সব তো গেছে, বাক্সেও কিছু রাখতে পারব না তোদের জ্বালায় ?

বাক্স খুলে কি অপরাধ করেছে বুঝতে পারে না স্বপ্তি। চিরকালই তো খোলে ; মা এমনি করে বলেন নাতো কোনদিন।

আর কোনদিন আমার বাক্সে হাত দেবে না কেউ।

গম্ভীর মুখে চলে যান স্নান করতে।

কিন্তু কেন ? এমনটিতো ছিলেন না কোনদিন। মা কেমন যেন পর হয়ে যাচ্ছেন দিনের পর দিন। অভাব অনটন, হয়তো ভাবতে হয় মাকে অনেক কিছু। কিন্তু ওরা কি বোঝে না ? ওরা কি ভাবে না ? মা-ই তো চাকরি করতে দিল না দাদাকে। কান্না পেল স্বপ্তির। কাঁদবেই বা না কেন ? বস্তিতে থেকেও সুখেই তো ছিল ওরা, সব এক নিমেষে কোথায় উড়ে গেল ? এল অশান্তি, এল গাম্ভীর্য, এল মৌনতা। আসবে ঝগড়া, আসবে চীৎকার, আসবে অভদ্র ব্যবহার। না এলে চলবেই বা কেন ? এ যে বস্তি, মনেপ্রাণে কাজে-কর্মে বস্তির বাসিন্দা হতে হবে ওদের।

মা এমনি করে আজকাল কত বকেন ওকে, কত দোষ ধরেন ওর কাজকর্মের। কিছুতেই যেন তৃপ্তি নেই। তবু কোন কথা বলে না স্বপ্তি। আব্দার-স্নেহ আশ্রয় নিয়েছে ভয় আর দুঃখে। সত্যি মাকে দেখলে দুঃখ হয় খুব। খাওয়া কমে গেছে। চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে। হবেই বা না কেন ?

সকাল বেলা রোজ বেরোন আর আসেন সেই বিকেলে। কিন্তু রোজ কোথায় যেতে হয় তাঁকে ? কেমন করে জানবে সে ? সে সাহস কোথায় ?

হ্যাঁরে তিলু, মা কোথায় যান তুই জানিস ?

ফাঁক পেয়ে জিজ্ঞেস করে সুপ্তি।

তিলুর মুখখানা কালো হয়ে যায়।

দু'তিনবার প্রশ্নের পরে জবাব দেয়।

জানি না পিসিমণি।

জানিস্ না ? তুই মিছে কথা বলছিস্।

পিসিমণি, ঠাকুমা বারণ করে দিয়েছেন বলতে। ও আমি বলতে পারব না, আমায় জিজ্ঞেস করো না পিসিমণি।

তা পারবি কেন ? এ ঘরে তোকে এনেছিল কে ? ভালবেসেছে কে ? না খেয়ে মরে গিয়েছিলি, খাইয়ে মানুষ করেছে কে ?

রাগের মাথায় বলে গেল সুপ্তি।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেল্‌ল তিলু। পিসিমণি কি করে বিশ্বাস করবে কেন সে বলতে পারে না। ওকে ভালবাসে পিসিমনী। নিজের মাকে ও দেখেনি, যাকে দেখেছে সে সৎমা। পিসিমণিই ওর মা। আজ তাকেই দুঃখ দিয়েছে, না দিয়ে উপায় নেই তার। কি করবে সে ? কোথাও পালিয়ে যাবে নাকি ?

বাবা সৎমাকে নিয়ে কাল এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। একবার খোঁজও নেয় নি তিলুর, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল তিলু, ওর বাবার মুখের দিকে। বাবা একবার ফিরেও তাকায় নি। তাই এখানেই ওর থাকা। যেতে পারে না ঠাকুমার বিরুদ্ধে, পারে না কিছু বলতে।

শেখা তো হয়ে গেছে বিড়ি-বাঁধা। একটা কাজ যদি পেত,তাও কোথাও কিছু হচ্ছে না ছাই।

সেদিন থেকে গম্ভীর তিলুও। কোন কথা বলে না আর কাউকে। টেষ্ট হয়ে গেছে অশেষের। টাকা জমা দিতে হবে ফিসের, মায়ের মন আজ কদিন ধরেই উদ্বিগ্ন। আরো বেশী।

সেদিন রাত তখন প্রায় দুটো, মায়ের চোখে নেই ঘুম, মনে নেই শান্তি। ঘুমোচ্ছে অশেষ স্বপ্তি তিলু। বিছানা ছেড়ে উঠলেন সন্তর্পণে। বাক্স খুলে কি একটা বার করলেন। হাত কেঁপে উঠল। আরো বহুদিন বার করেছেন, আবার রেখে দিয়েছেন এই জিনিসটা। কিন্তু আজ তো আর রাখা যাবে না। আজ তুলে নিতেই হবে তাঁকে। এই শেষ সম্বল। বার করে বেঁধে ফেলেন কাপড়ের খুঁটে।

কি চুরি করে নিলে মা?

বিছানা থেকে উঠে এল স্বপ্তি।

চুপ—

চমকে ওঠেন মা।

তোর দাদা শুনবে যে।

কিন্তু কি তোমার কাপড়ের খুঁটে?

তোর হার।

হার?

হ্যাঁ, আমার যা ছিল সবই তো গেছে। এবার এটাও গেল। তোর দাদা যেন কোনদিন টের না পায় স্বপ্তি।

মায়ের চোখে জল।

বেশ, কিন্তু রোজ তুমি কোথায় বেরোও মা?

গেঞ্জির কলে। আট-দশ আনার কাজ হয় রোজ।

মা,—

স্বপ্তিও পারল না থাকতে। ফেটে পড়ল মায়ের কোলে।

মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন মা।

এই নে চাবি, আজ থেকে তুই-ই খুলবি বাক্স। ওতে আর আমি হাত দিতে পারবো না স্বপ্তি।

তক্তপোষের উপর গোটানো বিছানা। তার সঙ্গে ঠেস দিয়ে নিয়েছে ছোট্ট একখানা আয়না। ড্রেস করছে তিলু। জলকাচা কুঁচকে যাওয়া সেই হাফসার্ট আর হাফপ্যান্ট পরনে। জামাটার পিঠের ওপর আড়াআড়ি ভাবে সুস্পষ্ট একটা রিপুর কাজ। পিসিমণি সেলাই করে দিয়েছিল কদিন আগে। কলার উঁচু করে টেনেটুনে নিল আর একবার। পরিপাটি করে ফিট্‌ফাট করে পরেছে প্যাণ্টটা। এখন কসরৎ চলছে চুলের ওপর। আয়নার সামনে। হাতে একখানা চিরুনি। কয়েকটি দাঁত ভাঙ্গা মাঝখানটায়। চুলটাকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারছে না তিলু। একবার সিঁথে কাটল বাঁ দিকে, আবার ডাইনে। এবার স্রেফ্ উল্‌টে দিল চুলটা। দূর ছাই। কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না। মাঝখানটায় কেমন খাড়া খাড়া হয়ে উঠল। নৌকোর মাস্তুলের মতো।

কিরে তিলু, বলি এই সাত সকালে হচ্ছে কি ?

মৃদুহাসে পিসিমণি।

ড্রেসিং।

হুম, বিনে মাইনে আপখোরাকি বিড়ি-বাঁধা শিখতে যাবি, তার জন্যে অত ড্রেসিং কিসের ?

বিড়ি-বাঁধা নয়, বিড়ি-বাঁধা নয়। ওসব ভদ্দর লোকের জন্যে নয়। ইন্টারভ্যু দিতে যাচ্ছি।

উ-উম্, নবাব সাহেবের চাকরি হবে আর কি ?

শুভ কাজে বেরুচ্ছি, অপমান কর না পিসিমণি।

তুই আবার মানের পাত্তর হলি কবে থেকে ?

দুত্তোর ছাই। আঁচড়াব না চুল।

চিরুনিটা ফেলে দিয়ে, চুলগুলো ওলটপালট করে ফেল্‌ল দুহাতের দশটী অঙ্গুল দিয়ে। রাগের মাথায় হাঁটা দিল বোঁ-বোঁ করে।

আবার রাগ হয়েছে দেখ।

ধরে ফেলেছে পিসিমণি। তারপর ঠিক করে সাজিয়ে দিল তিলুকে।

না, এবার বেশ মনের মত হয়েছে তিলুর। তাই বলি, পিসিমণি না হলে কি আর হয় এসব কাজ ?

পিসিমণি, চাকরি হলে তোমায় একখানা শাড়ি কিনে দেব, কেমন ?

আগে হোকতো চাকরি। এই মুড়ি কটা গিলে যেখানে যাবার যাও। ঘুরে এস।

গিন্নির মত বলে স্বপ্তি।

মুড়ি শেষ করেই চল্‌ল তিলু ঝড়ের বেগে।

হ্যাঁরে, জল খেলিনে।

দাও।......খেলিনে, খেলিনে বলে অত পিছু ডাকতে নেই পিসিমণি। দুর্গা। দুর্গা।

বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দুপুরে আজ আর খেতে এল না তিলু। মা স্বপ্তি অশেষ ভাবছে সবাই। গেল কোথায় ? সেই সকালে বেরিয়েছে, দেখাই নেই আর।

ভাবনাটা স্বপ্তির একটু বেশি। আজ কদিন ধরে গেঞ্জির কলেও যান না মা। ফুরনের কাজ। যা আট দশ আনা হত। সে আয়ের পথও বন্ধ হয়ে গেছে। মাকে যেতে বারণ করে দিয়েছে ম্যানেজার। কাজ নেই এখন। হলে খবর দেবে বলেছে। মার তাই মুখে কথা নেই, চোখে নেই ঘুম।

দাদাতো আজও টের পায়নি এসব কথা। পড়াশুনো করে যাচ্ছে নিশ্চিন্তে। হয়তো বুঝতে পেরেছে, মার কাছে তাহলে

সত্যি কিছু ছিল বা আছে যা দিয়ে চলছে এখনো। তা নয়তো অচল হয়ে যেত সংসার। দাদা তাই পড়াশুনো করছে একমনে। কিন্তু মা কি করছে না করছে, সুপ্তির তো অজানা নেই। এ সময়ে সত্যি যদি তিলুটার একটা কাজ হত তাহলে এক রকম চালিয়ে নিতে পারতো সে। সন্ধ্যা হয়ে গেল। ছটা, সাতটা, সাড়ে সাত…

পিসিমণি, পিসিমণি ..

ঐ তো তিলু আসছে। রাত তখন প্রায় আটটা।

কিরে এত দেরী যে?

চাকরি, চাকরি বুঝেছ, হয়ে গেল।

কত মাইনে? কোথায়?

সে সব এখন আর বলছি নে। পিসিমণি এই নাও।

কি?

লজেন্স।

খাব না আমি। ভারি তো লজেন্স।

খাবে না তো খাবে না। এই নাও কাকামণি।

এগিয়ে এল অশেষের কাছে। তক্তপোষের উপর খাতা পেন্সিল নিয়ে বসে 3rd paper-এর এসে নিয়ে ব্যস্ত ছিল অশেষ। তিলু আবার ডাকে।

এই নাও, চট্ করে গলাটা ভিজিয়ে নাও, কাকামনি।

যা, এখন ভাত খাগে যা। সারাদিন খাসনি কিছু।

খাইনে মানে? মুড়ি তেলেভাজা—দুআনা। আর এনেছি চার পয়সার এই লজেন্স। আর বাকি এই নাও।

বার আনা গুজে দিল পিসিমণির হাতে।

একটাকা রোজগার হয়েছে। প্রথম দিন বলেই খরচা করেছে চার আনা। এর পর পাঁচ দিনের পাঁচ টাকায় শাড়ি হবে আগে পিসিমণির। তারপরে সব অন্য কথা।

.. সে তো বুঝলাম। কত মাইনে বল?

জিজ্ঞেস করে সুপ্তি।

এক টাকা, পাঁচসিকে, দেড় টাকা, কোন ঠিক আছে তার? যেমন কাজ তেমনি পয়সা।—

বিজ্ঞের মত গা থেকে খুলে ফেলে জামাটা।

কোথায় হয়েছে বলবি না?

বলব, আগে চোখ বোজ।

আদেশ পালন করে সুপ্তি।

চট্ করে প্যান্টের পকেট থেকে বার করে মুখে পুরে দেয় একটা লজেন্স। খিলখিল করে হেসে ওঠে তিলু।

গালের লজেন্সটা সামলে নিয়ে আবার প্রশ্ন করে সুপ্তি।

কোথায় হয়েছে বল?

আবার কোথায়? মোড়ের সেই নতুন বিড়ির দোকানটায়।

টিবি। সোজা বাংলায় ক্ষয়রোগ। দুর্ভাবনায় সব চেয়ে বড় ক্ষয় শরীরের। টিবির জার্ম আছে সকলের মধ্যে। ডাক্তারদের মতে। তেমনি দুর্ভাবনার দুষ্ট কীট না আছে কার মধ্যে? আছে এ বাড়ির সকলকার। অশেষ সুপ্তি মা কেউ বাদ পড়েন না।

অশেষের পরীক্ষা হয়ে গেছে। পাশ ফেলের দুর্ভাবনা, চাকরির দুর্ভাবনা, দুর্ভাবনা বোনের বিয়ের।

সুপ্তি বড় হয়েছে। সংসারের দুর্ভাবনা, পয়সার দুর্ভাবনা, দুর্ভাবনা মায়ের জ্বরের।

মা শয্যাশায়ী হয়েছেন। টাকাপয়সার দুর্ভাবনা, ছেলের দুর্ভাবনা, দুর্ভাবনা মেয়ের বিয়ের।

জার্ম থাকলেও সবাই সবসময় যেমন আক্রান্ত হয় না রোগে—তেমনি অশেষ সুপ্তি শ্বরে পড়েনি বর্তমানে। বিছানা নিয়েছেন মা। ডাক্তার দেখালে বা এক্স্‌রে প্লেট নিলে দুর্ভাবনার জার্ম পাওয়া যাবে কিনা, জানি না। কারণ নেওয়া হয়নি তা। ওতে পয়সার প্রয়োজন কিনা। নেই ওষুধ, নেই পথ্য। বার্লিসেদ্ধ হলেও গিলতে চান না মা। ইচ্ছে নেই তার, সামর্থ্য নেই এতটুকু।

আছে শুশ্রূষা, আছে চোখের জল। সুপ্তির। মা বিরক্ত হন তাতে। জলের ধারা বাড়িয়ে দেয় সুপ্তি।

আছে অক্ষমতার গ্লানি, আছে হা-হুতাশ। অশেষের। দুঃখ পান মা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। গ্লানি বেড়ে যায় অশেষের।

আছে বিবেচনা, আছে প্রাণপণ চেষ্টা। তিলুর। মা ভাবেন এক টুকরো এই পরের ছেলেটার জন্যে। চেষ্টা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে তিলুর।

অশেষ করবে কি? দেখতে দেখতে দু আড়াই মাস কেটে গেল। নেই! চাকরি নেই। কেউ বলেছে "No vacancy।" কেউ জিগির তুলেছে ছাঁটাইয়ের। আবার কেউ বলছে "result out হোক। পরে এস।" কিন্তু এখন সে কি করবে? কোথায় যাবে?

হ্যাঁ; এটা ঠিক। খবরের কাগজের কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত পাঠায় নি সে। পাঠাবে যে, দু'আনা পয়সা কোথায় ষ্ট্যাম্পের? কোলকাতার অফিসে হলে না হয় হেঁটে যেতে পারতো। তাতো পারতো। গেছেও তো সে-সব অফিসের আশেপাশে। ঘুরেছে অনেক। কিন্তু ঢোকে নি সে অফিসে দরখাস্ত নিয়ে। কেন? কারণ আছে তারও। এম-এল-এ কিংবা কাউন্সিলর কোথায় পাবে সে। গেজেটেড্ অফিসার কিংবা মিনিষ্টার কে আছে তার? কি করে জোগাড় করবে সে তাদের কাছ থেকে ক্যারেকটার সার্টিফিকেট?

বাধা আছে আরো অনেক। রেলওয়ে সার্ভিস্ কমিশনের দরখাস্তের ফর্ম কেনার টাকা নেই তার। অন্য সরকারী অফিসের জন্য মনিঅর্ডার রসিদ কিংবা ট্রেজারীর চালানতো দূরের কথা। তাই সে চেষ্টা করে নি। পাঠায় নি দরখাস্ত। পাঠিয়েছে এমন জায়গায় যেখানে পয়সা লাগে না। মনোহারীর দোকানে কিংবা অভিভাবকের দরবারে। খাতা লিখতে নয়তো ছেলে পড়াতে।

পেল টিউশনি। একটা নয়, দু দুটো। দুবেলা দুজায়গায় পনের পনের তিরিশ টাকার কাজ। তা না হয় হল। কিন্তু এখন সে কি দিয়ে ডাক্তার আনবে? মায়ের ওষুধ? একমাস যেতে না যেতে আগাম টাকা চায় কি করে? আর চাইলেই বা দেবে কেন? তিলুর সব দিয়েও তো সংসারের খরচা আর মায়ের লেবু মিছরি বার্লি হয় না ঠিক মতন।

পাশ-ফেলের দুর্ভাবনাটা মাথা থেকে তাই পালিয়ে গেছে অশেষের। এটাই এখন বড়। জীবন-মরণ সমস্যা। পাশ করা না করাতে বিশেষ কিছু আসবে যাবে না তার। তাই সে চিন্তা ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু সময় মত সংবাদ পাওয়া গেল আগামীকাল বি, এ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে। মাও শুনলেন কার কাছ থেকে।

এ সংবাদ তাঁর বড় আদরের। বড় প্রিয়। তাঁর সাধনা সিদ্ধিলাভ করতে চলেছে। ক্ষীণ মনে আশার সঞ্চার হয়েছে আবার। অন্ধকারের ঘনঘটায় বিদ্যুতের আলোর মত পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তাঁকে এ শুভ সংবাদ। রোগের জ্বালা, দুর্ভাবনার গ্লানি তাঁর কাছ থেকে সরে গেল ক্ষণিকের জন্য। সারারাত ছটফট করে কেটে গেল। ঘুম নেই কোন চোখে। এ রাতে হল না একটুকুও। স্বপ্ন আবার স্বপ্ন। আশা আবার আশা। আলো আবার আলো।

ভোর হতে না হতেই মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন।

অশেষ, যা নিয়ে আয় তোর পাশের সংবাদ।

তেমন আগ্রহ বা ইচ্ছা ছিল না অশেষের। আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাবে ঘর থেকে। মা বল্‌লেন :

খবরের কাগজ একখানা নিয়ে আসিস। আমি দেখব নিজের চোখে।

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে ফেরিওয়ালা। নানা রকমের দৈনিক সামনে বেঁধে নিয়ে। একটা নয় একটার পর একটা। অশেষ দাঁড়িয়ে আছে ছবির মত। কৈ, কিনছে না তো কাগজ! পয়সা কোথায় পাবে? দশটা বা ছটা পয়সা তার থাকলে তো।

গিয়ে বসে পড়ল একটা ফাঁকা জায়গায়। একি, ওতো পুরুষ। চোখ দিয়ে জল পড়ছে কেন দরদর করে? লোকে দেখলে বলবে কি? বলবে—'সেন্টিমেন্টাল'। নয়তো পুরুষ বলেই স্বীকার করবে না ওকে।

ছুটি ছেলে খবরের কাগজ নিয়ে এসে বসল একটু দূরে। তারা পাশ করেছে। বলাবলি করছে পরীক্ষার কথা নিয়ে। কোন্ পেপার কেমন হয়েছিল, কত পাবে, মার্ক শীট কবে দেবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেখুন না Cal 237?

গলায় খাঁকারী দিয়ে বল্‌ল অশেষ।

জবাব এল না কিছু। তারা ব্যস্ত তাদের আনন্দ নিয়ে। গ্রাজুয়েট হয়েছে। যার তার সঙ্গে কথা বললে চলবে কেন আজ?

তবু দেখার কৌতূহল হল না অশেষের। উঠে গেল টিউশনি করতে। বলি বলি করে বলে ফেলল একটাকা ধারের কথা। আজ প্রায় পঁচিশ দিন ত হয়ে গেছে। পেল টাকাটা।

এদিকে ঘরে বিছানায় আর থাকতে পারছেন না মা। কালকের স্বপ্ন আজ তুঃস্বপ্ন আলো আঁধার হয়ে যাচ্ছে কেন? অশেষ ফিরছে না কেন? কত বেলা হয়ে গেল।

সুপ্তি করছে একবার ঘর একবার সদর। তিলুও নেই ঘরে। মাকে "দাদা আসছে" বলে বুঝ দেওয়া যাচ্ছে না আর। সদরের সামনেই দাঁড়িয়ে রইল সে অশেষের অপেক্ষায়।

মা 'অশেষ অশেষ' বলে উঠে বসলেন বিছানায়। নামতে চেষ্টা করলেন নিচে। দেওয়াল ধরে দাঁড়াতেই মাথা ঘুরে গেল তাঁর। আঁধার হয়ে গেল চোখের সামনাটা। সশব্দে পড়ে গেলেন এক মুহূর্তের মধ্যে।

কি হল? সবেগে ছুটে এল সুপ্তি।

অশেষ একখানা কাগজ কিনে ছুটতে সুরু করেছে বাড়ির দিকে।

মা মা, আমি পাশ করেছি মা।

ঘরে প্রবেশ করতেই হাত থেকে পড়ে গেল কাগজখানা।

মাটিতে লুটিয়ে পড়া মায়ের পায়ের ওপর পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তখনও কাঁদছে সুপ্তি।

হঠাৎ দুহাত দিয়ে ধরে ঘুরিয়ে দিল মাথাটা। বাঁ দিকে এককাপ গরম চা। আর ডান দিককার রাস্তার ফুটপাতের ওপর ছিল দুটো চোখের একটি মাত্র দৃষ্টি। ম্যাটিনি শো ভেঙ্গেছে। পিঁপড়ের মত লাইন ধরে চলেছে সিনেমা ফেরৎ বর-বধূ কুমার-কুমারীর দল। সংখ্যাগরিষ্ঠ মেয়েরা। গুনতিতে বেশি হবে বুড়ো নয় আইবুড়োরা। এই বহুভূত মনোমুগ্ধকর দৃশ্য এক মনে উপভোগ করছিল বাদল। হঠাৎ না বলে না কয়ে রসভঙ্গ করালে কে?

আর কে? স্বয়ং বিলাস। তার ওপর তো আর রাগ চলে না। দিব্যি নির্বিকার বসে চা খাচ্ছে। যেন জানে না কিচ্ছুটি। নিজেকে সামলে নিয়েছে বাদল।

আমার চা কি হল?

প্রশ্ন করে চায়ের দোকানের মালিকের উদ্দেশ্যে।

এই তো তোর চা আমিই খাচ্ছি। তুই তো ব্যস্ত ছিলি।

গম্ভীর মুখে বলে বিলাস।

সিনেমা ভাঙ্গা আরো দলবল এসে জুটল। এক একটা চেয়ার দখল করে। চা, চপ, সিগারেট বিড়ি চলল পরপর। সুরু হ'ল সিনেমা নিয়ে শেষ হ'ল রাজনীতিতে। মাঝখানটার আলাপের বিষয়বস্তু হ'ল সাহিত্য, ফুটবল, ক্রিকেট, দর্শন, ইতিহাস, অঙ্ক, সমাজ, সংসার, স্বাস্থ্য ইত্যাদি যাবতীয় ঘটনা-দুর্ঘটনা। মৃত্কণ্ঠে, উচ্চস্বরে, হাতজোর করে টেবিল চাপড়ে এগিয়ে চলল ওদের তর্ক-যুদ্ধ।

এক একটা বিষয়ে এক একজনের পারদর্শিতা। ওরি মধ্যে এক-আধজন আছে যারা সর্ববিষয়ে সমান দক্ষ—এক কথায় সর্বজ্ঞ। তর্কে যুক্তিতে টিটকারিতে ওদের জুড়ি নেই। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করবার আছে। বিলাস কথা বলছে কম, বলাচ্ছে বেশি। শুনছে বেশি শোনাচ্ছে কম। যে একটি আধটি কথা সে বলে সে কথাটির মূল্য অনেক বেশি, ওদের সকলের সকল কথার চেয়ে। অর্ডারগুলো হচ্ছে বিলাসের মুখ থেকে। বয়রা পরিবেশন করছে, তার মালিক খাতার ওপর কালি কলম চালিয়ে মিটার বাড়িয়ে তুলছে বিলাসের। রবিবাসরীয় সন্ধ্যা। জমেছে ভালই।

আস্তে আস্তে রাত বাড়তে লাগল। একে একে কেটে গেল সবাই। শেষ পর্যন্ত শেষবারের মত দুকাপ চা নিল বিলাস।

কিরে বাদলা ঝিমিয়ে পড়লি যে?

চোখ বুজে বলতে আরম্ভ করল বাদলা।

যে বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকে উচ্চারিত হয় না তাহাকেই ব্যঞ্জনবর্ণ কহে। সেই ব্যঞ্জনবর্ণ আমি। আর স্বরবর্ণ তুই। তুই যে ঝিমিয়ে পড়েছিস্, তখন আমাকে তো ঘুমিয়েই পড়তে হবে দেখছি।

কথা দুটিই সত্য। ঝিমিয়ে পড়েছে বিলাস। আনন্দ নেই, স্ফূর্তি নেই। কেমন একঘেয়ে হয়ে উঠেছে জীবন।

একাধারে জমিদার ও জজের একমাত্র ছেলে বিলাস। সহপাঠি দলবল নিয়ে বেশ জেঁকে বসে এই চায়ের দোকানে। মাঝে মাঝে

যায় কোন বাগান বাড়িতে। রাতভোর আনন্দ করে। সকাল বেলা ফিরে আসে ঘরের ছেলে ঘরে। তাই এপাড়ায় এ দলটার সুযশ সুনাম আছে। বিলাসের বাপ ডিষ্ট্রিক্ট জাজ। বাইরে থাকেন বেশির ভাগ। এবারে সেই যে এসেছেন পূজোর ছুটিতে আর যাবার নামটি নেই। তাই বেশ একটু মুস্কিলে পড়েছে বেচারা। নায়েব মুহুরীর কাছেও হাত পাততে পারছে না কদিন ধরে।

পাশেই সিগারেটের দোকান। বিলাস এক প্যাকেট ক্যাপষ্ট্যান আর বাদল এক বাণ্ডিল বিড়ি নিয়ে যাত্রা করল বাড়ির উদ্দেশ্যে।

বাবা বাড়ি এলে সব দিক থেকেই বিপদ হয় বিলাসের। গাড়ি-খানা নিয়ে ও বেড়াতে বেরুতে পারে না সকালে বিকেলে। সব বাবার হেপাজতে। তবে ভরসার কথা এই যে পূজোর ছুটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গাড়ি টাকা আনন্দ সব হবে ও কটা দিন গেলেই। বাদল ওর প্রধান সাকরেৎ। চেয়ে আছে বিলাসের মুখের দিকে। এই একাদশী তারও ভাল লাগে না মোটেই। আর ব্রেনটাও ওর বিকল হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। একটা প্ল্যান বাতলান একটা শলাপরামর্শ করা—সব বন্ধ হয়ে গেছে এক নিমেষে।

হাঁটতে হাঁটতে দুজনেই চলে এসেছে বিলাসদের বাড়িতে।

না মশাই ঘরভাড়া আপনাকে দিতে পারব না—

নায়েব কাকার গলা ভেসে এল কাছারি ঘর থেকে।

বাদল প্রশ্ন করল—

রাত নটার সময় আবার ঘর ভাড়া কিসের রে।

চলতো দেখি।

ওরে বাবা, আমি এখন যাচ্ছি নি!

ভয় কি? ব্লাড প্রেসারের রোগী—বাবা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কাছারী ঘরে ঢুকে দেখল নায়েব কাকার সামনে দাঁড়িয়ে বছর ত্রিশের একটি ভদ্রলোক। বা-কাঁধে একটি থলে। বগলে একটি বাক্স

সমেত বেহালা। আর সামনে রেখেছে ছোট একটি বেডিং আর একটি কালো কুজো।

কি হয়েছে নায়েব কাকা ?

প্রশ্ন করে বিলাস।

নায়েব কাকা এই অজ্ঞাতকুলশীল লোকটিকে কিছুতেই ঘর ভাড়া দেবেন না। কিন্তু লোকটিও নাছোরবান্দা, ঘর তার চাই-ই।

না মশাই, একা লোক সংসার নেই, স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, ঘরভাড়া আমরা আপনাকে দোব না।

কিন্তু আমি কোথায় যাই বলুনতো ?

হেসে হেসে আস্তে আস্তে বলে লোকটা।

আর শুনেছি ঘরটাতো বাড়ির বাইরের দিকে।

কোন্ ঘর নায়েব কাকা ?

আবার প্রশ্ন করে বিলাস।

ঐ যে পেছনদিককার বস্তির কলের সামনের ঘরটা।

ও! তা না হয় দিয়েই দিন। বিপদে পড়েছে ভদ্রলোক। হ্যাঁ, অগ্রিম টাকা এনেছেন সঙ্গে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ এই নিন—তিন মাসের অগ্রিম ছত্রিশ টাকা।

হেসে বলে ভদ্রলোক।

তিন মাসের! আমাদের তো এক মাস করেই.........

আজ্ঞে থাক তিন মাসেরই। আবার হয়তো খরচা হয়ে যাবে।

আপনি কোন কাজকর্ম করেন না বুঝি ?

আজ্ঞে না, আপাততঃ বেকার।

নায়েব কাকা বললেন—দেখলে তো, এরপরে ভাড়া দেবে কি করে ?

তবু অনুরোধ করে বিলাস।

কিন্তু এত রাতে টাকা পয়সা নিতে পারবেন না বলে জানালেন নায়েব কাকা।

বেশতো আপনি ওকে ঘরের চাবিটা দিয়ে দিন। দিন মশাই, টাকা দিন। রসিদ কাল পাঠিয়ে দেবখন।

লোকটি টাকা দিয়ে দিল বিলাসের হাতে। অগত্যা চাবি দিয়ে দিতে হল নায়েব কাকাকে।

নমস্কার করে বিছানা আর কুজো নিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা।

নায়েব কাকা, আমার নামে খরচা লিখে রাখবেন টাকাটা।

বালতির পর কলসি, কলসির পর বালতি। পরপর সাজানো রয়েছে বস্তির কলটার সামনে। কলে জল আসার ঢের আগে থেকেই। জল কলে এলে ঠোকাঠুকি হয় বালতিতে কলসিতে, নয়তো শাড়িপরায় আর গামছাপরায়।

কে বলবে এই সেই সুজলা বাংলার শ্রেষ্ঠ শহরের বস্তি। একফোঁটা জলের জন্য যেখানে মারামারি। নিরীহ ভালমানুষকেও যেখানে বেমালুম ঝগড়া করে যেতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রোজই এ দৃশ্য দেখে নিমেষ। তারপর ফাঁক পেলে নিজের কুজোটা ভর্তি করে এনে রেখে দেয় ঘরে। ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে যায় তারপর।

শুধু কি এই? কলের জল আসা ঝগড়া হওয়া, জানালায় দাঁড়িয়ে থাকার এই কি একমাত্র উদ্দেশ্য। না, কাকে যেন খোঁজে সে। সেই প্রথম দিনই সে দেখেছে একজনকে। যেন কতকালের পরিচিত সেই মুখ। এখন আর সে চমকে ওঠে না তাকে দেখে। আলাপ ও করেনি তার সঙ্গে। তবু তাকে অপেক্ষা করতে হয় তারই

জন্যে। দেখতে হয় দুচোখ ভরে এজায়গার এই স্বাতন্ত্র্যটুকু। শাড়িখানা ছেঁড়া হলেও ময়লা নয় তেমন। সে ঝগড়া করে না কারু সঙ্গে। দাঁড়িয়ে থাকে। সবার হয়ে গেলে তবেই সে জল ধরে তার।

ঐ তো আজও এসেছে। অপেক্ষা করছে সবার শেষ হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু এ কেন এল এই নোংরা বস্তিতে? ওর কে আছে আর? কি করে তারা? এমনি কত প্রশ্ন জাগে মনে। কিন্তু কোন কৌতূহল নেই নিমেষের এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য। কেন সে জানবে? কি অধিকার আছে তার? অতীতের আয়নায় সে দেখে তার নিজের ছবি। বর্তমানকে তাতে আর জড়াতে পারে না সে। জড়াবেও না কোনদিন। তাই সে দূর থেকে দেখে। ভাবে। আবার থেমে যায়।

সুপ্তি, তোর কলসি বসিয়ে দে বাছা,

নিজের বালতিটা তুলে নিয়ে ঘরের উদ্দেশ্যে তার স্থূল দেহ চালিয়ে দিল জনৈকা বিধবা। সুপ্তি। তাহলে সুপ্তি ওর নাম। এতদিনে জানতে পেরেছে নিমেষ—সুপ্তি।

কার সঙ্গে যেন মনে মনে মিলিয়ে নেয় ওকে। কত কথা মনে পড়ে যায়। না আর এসব ভাববে না সে। এইতো চোখের সামনে যাকে দেখছে তার নাম সুপ্তি। তার পরিচয় জানে না, কোন খবরই রাখে না তার। তবে মনে হয় এ কুমারী। বিয়ে হবে। চলে যাবে এখান থেকে। আর সে দেখবে না, ভুলে যেতে হবে সুপ্তিকে।

কৈ মশাই নিমেষবাবু? কদিন হল টাকা দিয়ে এলেন আর রসিদটা গিয়ে আনবার নামটি নেই। এই নিন মশাই।

আপনাকে মিছিমিছি কষ্ট পেতে হল। আমিই নিয়ে আসতাম সময় করে।

লজ্জার হাসি হাসে নিমেষ।

আরে, তাতে আর কি হয়েছে মশাই ? নায়েব কাকা তো বিলাস-কে দিয়ে দিয়েছে রসিদটা সেই সেদিনই। আপনার জন্যে অপেক্ষা করে করে আমাকেই আসতে হল। কোথায় আবার হারিয়ে যাবে। ফ্যাসাদে পড়বেন তখন।

ধন্যবাদ। বিলাসবাবুই বুঝি জমিদারের ছেলে ?

প্রশ্ন করে নিমেষ।

সেকি আপনি এখন বুঝলেন ? ছেলে—মশাই, একমাত্র ছেলে, খুব ভাল লোক, আমার বন্ধু। তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় রাখবেন, উপকার হবে।

হ্যাঁ যাব, মানে ঠিক সময় করতে পারি না।

কথা কেড়ে নেয় বাদল।

সময় করতে পারেন না মানে ? আপনি তো শুনেছি বেকা ... .ও, তাই বলুন

কলের দিকে নজর পড়ে বাদলের। সুপ্তি এক কলসি জল নিয়ে চলে গেল ভেতরে।

বিজ্ঞের মত আবার বলতে সুরু করে বাদল।

তা মশাই, আপনার রুচিবোধ আছে। তা সময় আর কি করে পারবেন ? ভাল ভাল।

সুপ্তির পথের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে যায় বাদল।

ছুটতে ছুটতে এসে বিড়ির দোকান থেকে এক প্যাকেট বিড়ি পকেটে পুরে এল সেই চায়ের দোকানে।

বিলাস এসেছে ? বিলাস ?

দোকানদার জানাল—না, আসে নি।

তাইতো, এখনো এল না? এক কাপ চা নিয়ে বসল বাদল। আড্ডার অন্যান্য দু একজন বন্ধু এলো। কারো সঙ্গে ভিড়তে পারল না ও। ভাল করে কথাও কইল না। মন খারাপ না ভাল বন্ধুরা বুঝতে পারে না কিছু। বিলাসের সবচেয়ে পিয়ারের লোক। ওর কথাই

আলাদা। যে যার চলে গেল। বসে থাকল বাদল। এক বাণ্ডিল বিড়ির প্রায় সব শেষ করে ফেল্‌ল। চা-ও চলল বার চারেক।

শেষ পর্যন্ত সেজেগুজে এল বিলাস। হাতে একটি গোলাপ ফুল।

এই যে, তোর জন্যে বসে আছি দু'ঘণ্টা ধরে।

অভ্যর্থনা করে বাদল।

এই নে,

গোলাপ ফুলটা দেয় বিলাস।

ওর চেয়ে ভাল জিনিস আছে আমার সন্ধানে। চল চল।

চাও খেতে দিল না বিলাসকে। বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

বিলাস বুঝল ভাব গতিক ভাল নয় বাদলের। প্রশ্ন করল।

বাবা এখনো কলকাতাই আছেন, মনে আছে তোর?

তা থাকবে না কেন? আজ শুধু পরিচয় করিয়ে দেব, ব্যস।

চটপট জবাব দেয় বাদল।

খুপ্তিদের ঘরের পেছন দিয়ে বস্তির একটা সদর গলি। সেই গলিতে ওদের ঘরের জানালার সামনে এসে দাঁড়াল বাদল। দেখিয়ে দিল বিলাসকে।

সত্যি, এমন সুন্দর রূপ আছে ওদেরই বস্তিতে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না বিলাস। এত কাছে এমন জিনিস থাকতে ঘুরে বেড়ায় সে কোথায় কোথায়।

ওর সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি কি বল?

প্রশ্ন করে বাদলকে।

তোর বাবা এখনো কলকাতাই আছেন, মনে আছে তোর?

পাল্টা প্রশ্ন করে বাদল।

তা থাকবে না কেন? আজ শুধু আলাপ করা বইতো নয়। ওরা তো আমাদেরই ভাড়াটে।

হতাশ দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বাদল। বিলাস ততক্ষণে এগিয়ে গেছে সদরের দিকে। ডাকল অশেষের নাম ধরে।

দাদা বাড়ি নেই।

ভেতর থেকে জবাব দেয় সুপ্তি।

বাড়ি নেই? ও!

ঘরে চলে আসে বিলাস।

অনেকদিন হয়ে গেছে। তোমাদের ঘরটা মেরামত করতে হবে দেখছি।

আপনি ..... ?

বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে প্রশ্ন করে সুপ্তি।

ও, আমায় চিনতে পারছ না? আমি তোমাদের জমিদারের ছেলে। নাম বিলাস। তা এমন ভাঙ্গা ঘরে বাস করছ, একবার খবর দিতে হয় ত!

দাদা তু একদিনের মধ্যেই যাবেন ভেবেছিলেন। বর্ষায় তো ভয়ানক জল পড়ে ঘরে।

তাতো পড়বেই। এমন ভাঙ্গা ঘর। পড়বে না? যাক্ সারাই করার ব্যবস্থা করে দেবখন।

তারপর দিন থেকে কাজ আরম্ভ হল মেরামতের। বিলাস নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করে। সুপ্তির কাছ থেকে মাঝে মাঝে চেয়ে খায় জলটা পানটা।

বিলাসের সুনজর সবার দিকে। সুপ্তিদের ঘরের কাজ শেষ হয়ে গেল। কাজ আরম্ভ হল অন্য ঘরের। সমস্ত বস্তিটা ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে হয়ে উঠল কয়েক দিনের মধ্যে। পান জল পাখার হাওয়া বিশ্রাম এসব ব্যাপারে সুপ্তিদের ঘরটাই পছন্দ করে বিলাস।

কিন্তু মেয়েটা কি রকম অন্য ধরনের, লজ্জা ভাঙ্গেনি এখনো।

বিলাস যখন আসে এ বস্তিতে কাজের তদারকে অশেষ তখন বেরিয়ে যায় টিউশনি নয়তো কাজের চেষ্টায়। বিলাসের

ঘনঘন শুভ পদার্পণের কথা শুনে বোনকে সাবধান করে দিয়েছে।

মোটেই ভাল নয় ঐ জমিদারের ছেলেটা। কি মতলবে ঘোরে, কে জানে।

বলেই খালাস্ অশেষ। এদিকে নজর দেবার মত ইচ্ছা বা অবসর নেই তার। অশেষ তো জানে বিনা স্বার্থে একপয়সা খরচা করে না ওরা। এও জানে যে ভাড়া দিয়ে বাস করে সে, তাই পুরনো ভাঙ্গা বাড়ি মেরামত করা তার কর্তব্য।

দিন ভরে ঘোরে অশেষ। এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, ডালহৌসী, ধর্মতলা কোন কিছু বাদ রাখেনি সে। অফিসে অফিসে ম্যানেজার মালিকের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরেছে আর ঘুরেছে। দরখাস্ত পাঠাতে এখন যে দু চার আনা খরচাও না করে এমন নয়।

টিউশনির ত্রিশ আর তিলুর ত্রিশ এর মধ্যেই সব খরচা চালিয়ে নেয় সুপ্তি। তার মাঝখান থেকেই দুচার আনা ব্যবস্থা করে ও।

কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে আর? আর কত কাল থাকতে হবে তিলুর ওপর নির্ভর করে? সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি খাটবে তিলু আর ও অসহায়ের মত বসে বসে শুধু দেখবে। যাপন করবে অলস জীবন। আর কত দিন? কতদিন আর? এর চেয়ে যদি বিড়ি বাঁধতেও শিখত। তাও ভাল ছিল বোধ হয়। নিজের ওপর একটা হতাশার অবিশ্বাস, কর্মের ওপর অক্ষমতার গ্লানি আর শিক্ষার ওপর একটা অহেতুক অভিমান পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে ওর মনের আনাচে কানাচে।

মন তাই চঞ্চল। সারাদিন ঘুরে বেড়ায় আর ভাবে সারাটা রাত। মাদুরের ওপর শুয়ে ছটফট করে। দুর্ভাবনা বোনের ভবিষ্যৎ ভেবে। সেদিনও শুয়ে আছে। ঘুম আসছে না চোখে। অসহ্য জ্বালা শরীরে। বিছানায় পড়ে থাকতেও পারছে না আজ আর। রাত বাড়তে লাগল। ভেসে এল একটা করুণ রাগিনী। এ যেন বয়ে

নিয়ে আস্‌ছে ওর মনের শূন্য বারতা। কে, কে বাজায় এই করুণ রাগিনী ? এই গভীর রাতে কার এই নিরব সাধনা ? কি এমন শক্তি তার যে ওর মনের কথা যন্ত্রের তারে তারে মিশিয়ে দিচ্ছে আকাশে বাতাসে। থাকতে পারে না বিছানায় অশেষ। ছুটে আসে ঘরের বাইরে।

এইতো, এই ঘর থেকেই ভেসে আসছে মূর্ত বেদনা। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল অশেষ।

বিছানার ওপর বসে বসে একমনে তার সুরের লহরী বাজিয়ে চলেছে নিমেষ। বেহালা তার যন্ত্র। যন্ত্রী—সুদক্ষ যন্ত্রী সে। যে কাঁদেনি কোনদিন, সে অপরকে কাঁদাবে কেমন করে ? কে এই লোক ? কি এর পরিচয় ? কেন এল এই বস্তিতে ? কিছুই জানে না অশেষ। তবু অযাচিত একটা শ্রদ্ধা, অবারিত একটু করুণায় মন আপ্লুত হয়ে ওঠে ওর জন্য।

সুপ্তির হয়েছে যত জ্বালা। দাদা বারণ করেছে বিলাসের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতে। সুপ্তিরও মোটেই ভাল লাগে না বিলাসকে। ওর চালচলন কথাবার্তা কেমন একটু অন্য ধরনের।

কেন যেন ভয় হয় ওকে দেখলে। বিলাসের তবু লজ্জা নেই চোখে মুখে। সুপ্তি তো ভাল করে কথা বলে না, তবু বার বার আসে। ডাকে ওর নাম ধরে। এদিকে বস্তির পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতে সুরু করে দিয়েছে এরি মধ্যে। তাদের আর দোষ কি ?

বস্তির কাজ শেষ হয়ে গেছে। তবু বিলাসের আসা চাই। রোজ অন্ততঃ একবার করে। তাই সবাই হাসাহাসি করে। কানাঘুষা করে নিজেদের মধ্যে। সত্যি, খুব বেশি রকমের বাড়াবাড়ি

করেছে বিলাস। বায়না তুলেছে সুপ্তির হাতের রান্না একদিন খাবে বলে। সুপ্তি কি বলবে? কেমন করে বলবে যে 'রান্না করে আমি দিতে পারব না।' এইতো আজ এসে জোর করে রেখে চলে গেছে কুড়িটা টাকা। আর বলে গেছে—

তোমার যেদিন সুবিধে হয় রান্না করে খাওয়াবে মাংস। আমাকে আর আমার বন্ধুকে।

এদিকে দাদা শুনলেও ভীষণ রাগ করবে, জানে সুপ্তি। কিন্তু দাদার মত না নিয়ে কিছুতেই সে করতে পারবে না এ কাজ। তাই সেদিন রাত্তিরে সমস্ত ঘটনা খুলে জানাল দাদাকে।

অশেষ বেশ একটু চিন্তিত হয়ে গেল প্রথমটায়। পরক্ষণেই হেসে বল্‌ল—

বেশ তো, রান্না করে খাইয়েই দে না একদিন। দেখুক যে গরীবের মেয়েরাও রান্না করতে জানে। মাংস, পোলাও, কালিয়া, কোর্মা সব কিছু। আর আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে একটু ভাল মন্দ খাওয়া হবে, কি বল?

দিন স্থির হল। নিমন্ত্রিত হল বিলাস আর তার বন্ধু বাদল।

সেদিন সকাল থেকেই বাড়িতে অশেষ, অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে হবে তো। কিন্তু মতলব কি অশেষের। ডেকে বল্‌ল বোনকে—

সুপ্তি, রান্নাবান্না হয়ে গেলে পরিষ্কার একখানা কাপড় পরে নিস্ বুঝলি। বড় লোক জমিদারের ছেলে। ময়লা ছেঁড়া পরে ওদের পরিবেশন করতে নেই।

হঠাৎ বড় লোকের প্রতি এমন একটা শ্রদ্ধা দেখে কেমন ঘাবড়ে যায় সুপ্তি। ভয় বেড়ে যায় আরো। কেমন করে দাঁড়াবে ওদের সামনে।

ঠিক সময়ের অনেক আগেই এসে উপস্থিত হল বিলাস আর

বাদল। নানা রকমের গল্প কথাবার্তা চল্‌ল অশেষের সঙ্গে। ঠিক সময়ে খেতে বসল ওরা।

বাদল খেল প্রাণভরে। বিলাস দেখল ছুচোখ ভরে। সুপ্তিকে। একটা সাধারণ পরিষ্কার শাড়িতে কেমন সুন্দর মানিয়েছে ওকে। আজ যেন নূতন করে দেখছে ও।

দুজনেই ভূয়সী প্রশংসা করল ওর রান্নার। মুখ হাত ধুয়ে পান চিবোতে চিবোতে একটা সিগারেট ধরাল বিলাস। ধোঁয়া ছেড়ে বল্‌ল—

আপনার ভাগ্য ভাল, অশেষবাবু। এমন একটি বোন পেয়েছেন।

হাসে অশেষ। কথা বলে না কোন।

তা দেখুন, এদেরও একটু বেড়ানো খেলানো দরকার। সব সময় ঘরে আটকে রাখলে শরীর মন টিকবে কেমন করে?

উপদেশ দেয় বিলাস।

মৃদু হেসে অশেষ বলে—

সে তো সত্যি, কিন্তু আমাদের আর উপায় কি বলুন?

বিশেষ করে এই এমন বস্তিতে। আলো নেই, হাওয়া নেই। মাঝে মাঝে বেড়াতে পাঠাবেন কোথাও।

দেখি।

আমতা আমতা করে অশেষ।

কাল রোববার, না?

বাদল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়।

হ্যাঁ, কাল রোববার।

বেশ তো, আমিই কাল বেড়িয়ে নিয়ে আসবখন। মাঠের দিক থেকে। কি বলেন, অশেষবাবু?

বিনীত কণ্ঠে বলে অশেষ—দেখুন আমি বড়ই মুস্কিলে পড়েছি। এমন বস্তিতে ওকে আর বেশিদিন রাখা ঠিক নয়।

তা অন্য কোথাও ঘর দেখছেন নাকি ?

না। তবে আপনি চেষ্টা করলে একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। আপনি তো অনেক করেছেন আমাদের জন্য। তাই একটা অনুরোধ করব।

বেশ তো, করুন না। অত ভণিতা কিসের ?

জবাব দেয় বাদল।

ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করে অশেষ—

দেখুন বিলাসবাবু, আমার অবস্থা আপনি তো সবই বোঝেন। এমন মেয়েটা কোথায় কার হাতে গিয়ে পড়বে, আপনি যদি দয়া করে ওকে গ্রহণ করেন……

আ-য়া-মি ?

থতমত খেয়ে যায় বিলাস।

সে কি মশাই, আপনি বলছেন কি ? বামুন হয়ে চাঁদে হাত ? বিলাস জমিদারের ছেলে। এম-এ পড়ছে। বিলেত যাবে। আর আপনার বোন ? নন্‌ম্যাট্রিক। তাও যদি টাকার জোর থাকতো। দিতে পারবেন মশাই দশহাজার টাকা পণ ?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বাদল।

সে সব কথার জবাব না দিয়ে আবার অনুরোধ করে অশেষ।

বিলাস বাবু, আমরা তো সবর্ণ। করুন না এই উপকারটুকু।

লাল হয়ে গেছে বিলাস। উত্তর না দিয়ে উঠে পড়ে তক্তপোষ ছেড়ে।

জবাব দেয় বাদল—

আশ্চর্য স্পর্ধা মশাই আপনার ? মেয়েটিকে ভাল লেগেছে। একটু হেসে কথা বলেছে। তাই যখন যা ইচ্ছে তাই আব্দার করে বসবেন ?

দৃঢ় বিনীত কণ্ঠে উত্তর দেয় অশেষ—

আব্দার তো আমি করি নি বাদলবাবু। কারণ জানি গরীবের আব্দার সাজে না। সেটা আপনাদেরই একচেটে। তাই গরীবকে হাতের পুতুল মনে করে তাদের নিয়ে খেলতে আনন্দ পান। যাক, জেনে রাখুন, গড়ের মাঠ, খোলা হাওয়া—সেটাও আপনাদেরই একচেটে। আমাদের স্বাস্থ্য খুব ভাল টেঁকে এই নোংরা বস্তিতেই।

কি, এত বড় কথা। দস্তুর মত অপমান করেছে অশেষ।

রাস্তা চলতে চলতে ভাবে বিলাস। এত তেজ, এত গর্ব? কিন্তু ভাঙতেই হবে। যে ভাবেই হোক উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু কি করে? কেমন করে নেবে এই অপমানের প্রতিশোধ?

তুই কিছু ভাবিস নি বিলাস। একটা দিন আমায় শুধু ভাবতে দে।

সান্ত্বনা দেয় বাদল।

রাখ, ছাই করবি তুই।

ধৈর্য হারিয়েছে বিলাস।

দু'জনেই চুপ। পাশাপাশি চলেছে রাস্তা। বিলাস ভাবছে অপমানের কথা। বাদল কষছে প্ল্যান্, প্রতিশোধ নেবার প্ল্যান্। জব্দ করতেই হবে অশেষকে। বেকার একটা ভবঘুরে ছোঁড়া, তার এত ডাঁট্। একটা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবে না। তখন দেখবে কোথায় থাকে ওর বড় বড় বুলি? কিন্তু কি করা যায়? গুণ্ডা লাগাবে ওর পেছনে? না সেটা বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। হাতে নয় ভাতেই মারতে হবে ওকে।

ততক্ষণে ওরা পৌঁছে গেছে বিড়ির দোকানের সামনে। মোড়ের সেই দোকানেই বিড়ি বাঁধে তিলু। ঝুলতে ঝুলতে তালে তালে সুতোয় পাক দিচ্ছিল বিড়ির। বিলাস এক প্যাকেট ক্যাপষ্টেন নিল। কোন কথা নেই তার মুখে।

বাদল নিল বিড়ি। দড়িতে ধরাতে গিয়ে হঠাৎ মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল বাদলের। এই ছোঁড়াটা অশেষদের সঙ্গে থাকে না?

হুঁ, ওর রোজগারেই তো চলেছে সংসার। দড়িটা ছেড়ে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল নাক মুখ দিয়ে।

না ঃ, এই বিড়ি আর খাওয়া যাবে না। যাচ্ছেতাই!

কি হয়েছে বাবু?

প্রশ্ন করে দোকানদার।

আর কি হবে। quality খারাপ হয়ে গেছে বিড়ির। এতদিন কিছু বলিনি। কিন্তু আর খেতে পারছিনা এগুলো। কে তৈরী করে বিড়ি?

এই তো, এই ছেলেটি—তিলু।

ওয়ার্থলেস্। ঠিক আছে, আমি অন্য দোকান দেখে নেবখন।

বাদলের সংকেত আর ইসারায় বিলাস এত সময়ে বুঝতে পেরেছে ওর মতলবটা। সেও বল্‌লে—

তুমি কত পাবে দেখে নিও হে। আমিও অন্য দোকান থেকেই খাব সিগারেট।

দোকানদার ভাবল—শুধু বিলাস কেন, ওদের দলের সবাই বিড়ি সিগারেট পান কেনা ছেড়ে দেবে এ দোকান থেকে।

সবিনয়ে বল্‌ল—

আপনারা আমার পুরনো খদ্দের। অন্য দোকানে যাবেন কেন বাবু? আমি ওকেই জবাব দিয়ে দিচ্ছি।

বোঁ বোঁ করে মাথা ঘুরে গেল তিলুর। কিন্তু রোধ করা গেল না জবাবের আদেশ। গেল চাকরি। শত অনুরোধ সহস্র কান্না-কাটি একটুও টলাতে পারল না দোকানদারকে। তার দোকানের নাম খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যাদের দিয়ে দোকান, তারাই যদি বন্ধ করে দেয় খাওয়া, তাহলে তিলুকে আর সে রাখবে কেমন করে?

কে বললে ভোর হয় না দুঃখের রাত? মিথ্যে কথা। দুঃখের নিশি শেষ হয়ে আসে দুঃখের প্রভাত। এমনি করেই দিন, দিনের পর রাত আসছে অশেষের জীবনে। তিলুর কাজ নেই আজ প্রায় একমাস। এ ক'দিন কি চেষ্টাটাই না সে করেছে একটা কাজের জন্য। কিন্তু কাজের দরখাস্ত করা, তদ্বির করা, ইণ্টারভিউ দেওয়া—এ সমস্ত কি করে শেষ হবে মাসের মধ্যে। দু এক জায়গা থেকে আশা পেয়েছে অশেষ। কেউ বলেছে এক মাস পরে। কেউ বলেছে দু'মাস। কেউ সময় নিয়েছে তিন মাসের। কিন্তু তিন দিনও অপেক্ষা করার সময় নেই অশেষের। কোথায় সে যাবে? কাকে ধরবে, কার কাছে জানাবে দুঃখের নালিশ?

মাঝখানটায় খুব মিশেছিল নিমেষের সঙ্গে। কিন্তু এই লোকটা যে কি, কিছুই বুঝে উঠতে পারে না আজও। অশেষ ওর দুঃখের কথা সব জানিয়েছে নিমেষকে। সে কিন্তু বলে নি তার একটি কথাও। সারাদিন ঘরে থেকে বিকেল চারটের পর সে কোথায় যায়—কি করে না করে—একটি কথাও আদায় করতে পারেনি অশেষ। লোকটা শুধু সব কথায় হাসে। সোজাসুজি বলে না কিছুই। তবু হয়ত কথা বলতো নিমেষের সঙ্গে। হয়তো রাখত ভাব তার সঙ্গে। কিন্তু তা আর বেশি দিন সম্ভব হল না।

ওর আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়েছে অশেষের কাছে। নেশা করতে দেখেছে সে তাকে। নিমেষ অবশ্য ওর এই বদস্বভাবের কৈফিয়ৎ দিয়েছে হেসে—

ভাত যখন জোটাতে পারি না পেটের, তখনই খাই চার-ছ পয়সার তাড়ি। পেটের জ্বালা বেশ ভুলে থাকা যায় এতে।

তবু হয়তো অশেষ ক্ষমা করত নিমেষকে। কিন্তু একদিন

সে যা ব্যবহার করেছে, বয়সে বড় হয়েও যা বলেছে তাকে, তা আর জীবনে ভুলতে পারবে না সে। চাকরি পায় না কোথাও। সে দুঃখের কথা জানাতে গিয়েছিল নিমেষকে।

তাতে সে একটা জঘন্য ইতর পরামর্শ দিয়েছিল তাকে। এটা ঠিক, অর্থ হয়তো আসত তাতে। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে সে, কিছুতেই তার পরামর্শ মেনে নিতে পারে নি। সেই থেকে যাতায়াত এমন কি সংশ্রব বন্ধ করে দিয়েছে অশেষ। প্রথম দেখে তার প্রতি এসেছিল শ্রদ্ধা। এসেছিল করুণা। আজ এসেছে ঘৃণা। এসেছে সন্দেহ।

কিন্তু আরতো পারা যায় না। ধার, দেনা, বাকি—সমস্ত অস্ত্র শেষ হয়ে গেছে। ছোট বোনটার মুখের দিকে তাকানো যায় না আর। তিলুটাও লজ্জায় ভয়ে মন-মরা হয়ে গেছে একেবারে। বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছে ছ'মাসের। একটা টিউশনি তাও চলে গেছে ঠিক এসময়েই। তারা অন্য কোথায় উঠে চলে গেছে। সারাটা দিন বিনা কারণে ঘুরে বেড়ায় অশেষ। এখন শুধু আর অফিসে অফিসে নয়, রাস্তায় রোদ্দুরে মাঠে ঘাটে।

আজ দুদিন ধরে আর কিছুই জোটাতে পারেনি। স্মৃপ্তি আজ আর মাথা তুলতে পারছে না তাই। এদ্দিন সে থালাটা ঘটিটা বাটিটা তিলুকে দিয়ে বিক্রি করিয়ে রান্না করেছে অন্ততঃ এক বেলা। এ দুদিন আর কিছুই করতে পারেনি সে। দাদা আর তিলুর জন্যে ভেবে ভেবে আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে। কাজ নেই কিছু। লাইন দিয়ে জলটা ধরে রাখে—এই কাজ তার।

আজও এসেছে কলে। কিন্তু আর দাঁড়াতে পারছে না জলের জন্যে। বসে পড়ল এক পাশে। বসে বসে কেটে গেল প্রায় ঘণ্টা দুই। মাথা ঘুরে পড়ে গেল সে।

একটু দূরে বস্তির কটা ছেলে দাঁড়িয়ে। হেসে উঠল। নানা

রকমের কুৎসিৎ মন্তব্য করল ওর এ অবস্থা দেখে। মেয়েরা ছেলেরা যে যার বালতি কলসি নিয়ে ব্যস্ত। কেউ ভ্রূক্ষেপ করল না। কারো মুখে সমবেদনা, আর কারো মুখে সমালোচনার বাণী। কেউ এগিয়ে এল না ওর কাছে। কেউ ধরে তুলে নিয়ে গেল না ঘরে।

নিমেষ তার ঘর থেকে দেখল এদৃশ্য। ওকে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিল ওদের ঘরের তক্তপোষের ওপর। জল হাওয়া দিয়ে সুস্থ করে তুলল ওকে। সুপ্তির মেটে কলসিটায় জল ধরে রেখে গেল ঘরে। তিলু ফিরে আসতেই আস্তে আস্তে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বাড়ির বাইরে।

তিলু শুনল পিসিমণির অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কথা শুনাল নিমেষের নিরব শুশ্রূষার কথা। অশেষও রাত্রিতে এসে শুনল সব। কি এই লোকটা, কি এর চরিত্র কিছুতেই কিছু বুঝতে পারে না অশেষ। শ্রদ্ধা ঘৃণা করুণা সন্দেহের মিলিত একটা ভাব ওর প্রতি।

কিন্তু সবচেয়ে বড় ভাবনার বিষয় নিমেষ নয়, তার নিজের সংসার। ওর চূড়ান্ত অক্ষমতা। না খেতে পেয়ে বোনটা তাই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। এর চেয়ে নির্মম আঘাত ওর আর কি আসতে পারে জীবনে? আর একবার সে শেষ চেষ্টা করে দেখবে। প্রাণ দিয়েও বাঁচাতে হবে তার একমাত্র বোনকে। এককোঁটা ওষুধের জন্য হারিয়েছে মাকে। এমনি করে বোনকে সে হারাতে পারবে না। কিছুতেই না।

যাবে সে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার রায় সাহেবের বাড়িতে। জীবনে সে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে এমন ইচ্ছা ছিল না ওর। কিন্তু আর সাজে না তার এই মান-অভিমান।

সুপ্তি ঠিকই বলেছে—

সে তো আর তোমায় ভিক্ষে দেবে না দাদা। শুধু একটা চাকরি। তুমি পরিশ্রম করে তার কাজ করে দিয়ে টাকা রোজগার করবে। এতে আর দোষ কি?

না কোন দোষ নেই এতে। তাই সে যাবে রায় সাহেবের বাড়ি।

বালিগঞ্জের সেই বাড়িতে এসে শুনল এখানে আর থাকেন না তিনি। এ বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়েছে। উঠে গেছেন পাকপাড়াতে।

পরদিন এল অশেষ পাকপাড়ার বাড়িতে। দুচোখ দিয়ে ভাল করে দেখল অশেষ। এই সেই বাড়ি। যা তৈরি হয়েছে তার আর তার মত আর দশজনের টাকায়। তিনতলা কি বিরাট অট্টালিকা। গেটে দারোয়ান। ফুলের বাগান। কি নেই এর? গাড়ি সম্মান ক্ষমতা প্রতিপত্তি, কোনটা নেই এবাড়ির মালিকের?

দারোয়ানের কাছ থেকে জানা গেল ব্যস্ত বড় রায় সাহেব। অপেক্ষা করতে হবে। করল অপেক্ষা। এক দুই তিন প্রায় চার ঘণ্টা। হুকুম হল আজ দেখা হবে না।

তার পরদিন দেখা হল রায় সাহেবের সঙ্গে। বল্লেন—

আজ বড় ব্যস্ত আছি, কাল এস।

এল কাল। পেশ করল ওর দরখাস্ত। স্মরণ করিয়ে দিল তাঁর নিজের কথা যে বি, এ, পাশ করে এলে চাকরি করে দেবেন তিনি।

সব শুনে বল্লেন রায় সাহেব—

আমার কাছে তো কোন কাজ নেই। এমনিই অনেক বেশি লোক রয়েছে এখন। কিন্তু ছাঁটাই করবার উপায় আছে [illegible] ফ্যাকটরী [illegible], কোম্পানী আইন, হরতাল, ট্রাইব্যুনাল—[illegible] রকমের ঝামেলা। তুমি বিমলাচরণের ছেলে, দেখি যদি অন্য কোথাও কিছু করে দিতে পারি। তুমি বরং দিন সাতেক পরে একবার এস।

এল আবার দিন সাতেক পরে। সরাসরি চলে এল ঘরে। দারোয়ান চিনে নিয়েছে তাকে। বাধা দিল না আজ আর। অশেষ দেখল রায়সাহেব বড় ব্যস্ত। কথা বলছেন সেই টাকমাথা সরুফ্রেমের চশমাওয়ালার সঙ্গে। বিষয়, আগামী পৌর নির্বাচন। সেই চশমাধারী লোকটা খুব ভরসা দিচ্ছে—

আপনি কিছু ভাববেন না। ইলেকশনে নির্ঘাৎ জিৎ আপনার।

কথার সমর্থনে কোন্ কোন্ সংঘ সমিতির সঙ্গে সে আলাপ আলোচনা চালিয়েছে সে সমস্ত বর্ণনা করতে লাগল একের পর এক।

অশেষ, এই যে, এসেছ তুমি?

অভ্যর্থনা করলেন রায়সাহেব।

একটি চাকরি আমি করে দেবই। এই নাও পাঁচটা টাকা, তোমার যাতায়াত ভাড়া বাবদ।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অশেষ।

আবার বল্লেন রায় সাহেব—

তোমার চাকরি তো, আমি দেখবখন আরো কজনকে বলে। তুমি এস মাঝে মাঝে।

ওর ঠিকানা তো জানেন না রায় সাহেব। রেখে আসবে নাকি, কোন খবর থাকলে জানাবার জন্যে। কিন্তু কি ভাবছে ও, দায় পড়েছে রায়সাহেবের ওর চাকরি করে দেওয়া বা বাড়িতে খবর দেওয়ার।

পাঁচ টাকার নোটটা ভাঙ্গিয়ে দু আনার পুরি খেল অশেষ। ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছিল তার। বোনটার জ্বর। লুবু নিল তিনটে দুআনা দিয়ে। নিল কিছু বার্লি কিছু মিছরি, আর তিলুর জন্যে আনা দুয়েকের পুরি।

স্বপ্তি, স্বপ্তি, এই নে বার্লি। যদি কোথাও থেকে একটু জল ফুটিয়ে আনতে পারিস। দেখ।

ছেঁড়া কম্বলের একপাশ জড়িয়ে একপাশ পেতে শুয়েছিল স্বপ্তি। তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

গায়ের শার্টটা খুলে রাখতে গিয়ে অশেষের চোখ পড়ল কতগুলো ভাল তাজা লেবু, আঙ্গুর, বেদানা আর এক কৌটো হরলিকসের ওপর!

রাগে ফেটে পড়ল অশেষ—

কি? আবার এসেছিল সে? ফের হাত পেতেছিস্ ওর কাছে? লজ্জা করল না তোর?

দাদা, তুমি বিশ্বাস কর আমি ওকে……

থাক থাক। আমি বুঝেছি সব। আমি খাওয়াতে পারি না! আর এমন ভাল ভাল খাবার এনে দেয় ও!

দাদা, তুমি বিশ্বাস কর। পাছে কথা বল্‌লে বেশি সময় থাকে তাই কথা বলিনি ওর সঙ্গে। এ জিনিষগুলো রেখে চলে গেছে।

তুই রেখেছিস্ কেন? না রাখলে দিয়ে যেতে পারে? বড় লোকের ছেলে—ওর ঐ লেবু আঙ্গুর বেদনা—ঐ খা তুই। দরকার নেই এতে।

পকেট থেকে লেবু তিনটে বার করে ফেলে দিতে গেল জানালার দিকে।

ওর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল স্নৃপ্তি—

তুমি ফেল না দাদা, ও বিষ আমি খাব না। কিছুতেই খাব না।

একটা একটা করে সব কটি জিনিস তুলে ফেলে দিল জানলা দিয়ে। আঁচলে চোখ মুছে তুলে রাখল দাদার লেবু তিনটে। বালি, মিশ্রি নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শান্ত হয়েছে অশেষ। তাকিয়ে দেখল লেবু তিনটের দিকে। কোনটা শুকনো কোনটা বা পচা অর্ধেকটা। আর বিলাস যা দিয়ে গিয়েছিল সেগুলো কত ভাল! যদি রেখেও থাকে স্নৃপ্তি, এমন কি অন্যায় করেছে? আজ কদিন জ্বর। কিছুই এনে দিতে পারে নি মুখে। তিলুই মোট-বয়ে চেয়ে-চিন্তে কোন রকম এক বেলা সেদ্ধ করে দিয়েছে দুটো চাল! ঘৃণায় অপমানে দুঃখে সম্বিৎ ফিরে পায় অশেষ! সেদিন রাত্রে আর সে মুখ দেখাতে পারেনি ওদের! মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে পড়ল ঘরের মেঝেতে!

কদিন পরে তিলু কাজ পেল একটা চায়ের দোকানে। চা দেওয়া কাপ ডিস ধোয়া কাজ পেল সে। খাওয়া দাওয়া আর দশ টাকা মাইনে। অগ্রিম নিয়ে এসেছে পাঁচ টাকা। এতে ওতে কোন রকমে আরো চলল কটা দিন।

আবার এল অশেষ রায় সাহেবের বাড়িতে। রায় সাহেব তখন এক গাদা টাকা নিয়ে বসেছেন। এক এক করে এল বিভিন্ন সঙ্ঘ সমিতির ছেলেরা মেয়েরা। গোছায় গোছায় নোট নিয়ে চলে যায় তারা। রায় সাহেবের হয়ে খাটবে। ভোট জোগাড় করে দেবে তাঁর।

অশেষ বসে রইল চুপ করে। ফাঁক পেয়ে বল্‌ল তার চাকরির কথা।

চাকরি তোমার হবে। এই কটা দিন পরেই। ইলেক্‌শানটা হয়ে যাক। তুমি বরং চলো। আমার সঙ্গে একটু ঘুরে আসবে কর্পোরেশন অফিস থেকে। একটু বোস। আমি আসছি।

চলে গেলেন ভেতরে। ভুলে পড়ে থাকল টাকা শুদ্ধ মনিব্যাগটা। অশেষ দেখছে-সেই মনিব্যাগ, সেই টাকা।

ঝড় উঠল মনে। তুলে নেবে নাকি ? কিন্তু সে তো চুরি। রায় সাহেবও তো চুরি করে বড় হয়েছেন। তার ন্যায্য প্রাপ্যের কিছুটা যদি ছিনিয়ে নেয় সে কোন অপরাধ হবে তার ? হবে বৈকি। চুরি সব সময় চুরি। মহাপাপ।···কিন্তু মা মারা গেছেন একরকম না খেয়েই। বোনটাও যদি মারা যায় ? বাড়ি-ভাড়া বাকি চার মাসের। দোকানদারের দেনা বোনের পথ্য জোগাড় করতে যদি সে না পারে, কি মূল্য থাকবে তার এই সততার ? কে দেবে সেই মূল্য ? তুলে নিল ব্যাগটা। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ছুট ছুট ছুট। ছুটে চলে এল নিমেষের ঘরে।

নিমেষ, চুরি করেছি। অনেক অনেক টাকা। তুমি আমার গুরু। তোমার কাছেই এলাম।

চুরি করেছ, ধরা পড়নি ?

পাগলের মত হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে নিমেষ।

আমি ত সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে গেছি। চুরির টাকা হজম করতে পারিনি একটিও। তবু জেল হয়েছিল আমার তিন বছরের। তোমার তো হবে দশ বছরের।

উত্তেজনা উত্তাপ অনুভূতির পর ভেঙ্গে পড়ল অশেষ।

ছি ছি ভুল করেছি। চুরি করেছি? চুরি? দুশ টাকা চুরির দায়ে যদি জেল হয়ে যায় আমার?

পাল্টা প্রশ্ন করে নিমেষ।

হ্যাঁ, জেল তোমার হতে পারে। কিন্তু যারটা চুরি করেছ সে তো বড় চোর, তার জেল হল না কেন? তুমিও যেদিন পারবে চুরি করতে লাখ দু'লাখ টাকা সেদিন আর তোমারও ভয় থাকবে না জেল হওয়ার।

নিমেষের হাসি কোথায় এখন? এখন দেখলে কি মনে হবে যে সে জানে কেমন করে হাসতে হয়?

ওর এমন মূর্তি আর কোন দিন দেখেনি অশেষ। বলতে ভরসা হয় না আর কিছু।

তবু প্রশ্ন করে আর একবার।

ফিরিয়ে দিয়ে আসব টাকাটা? হাজার হোক ভদ্রলোক তো আমরা।

ভদ্রলোক?

প্রচণ্ড হাসি হেসে ওঠে নিমেষ।

...ভদ্রলোক তবে বোকা। ফিরিয়ে দিতে গেলে এখন তোমায় ধরিয়ে দেবে তোমাদের সেই রায় সাহেবই।

চুপ হয়ে যায় নিমেষ।

অশেষেরও নেই আর কিছু বলার মত।

আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে নিমেষ আবার।

আচ্ছা, আমাকে দেখে কি মনে হয় তোমার? ছোটলোক, না? সত্যি তো, চুরি করার পরামর্শ দিয়েছি, নেশা করি, ভদ্রতার ছাপ আমার গায়ে আর কই। কিন্তু যখন জানবে আমি চোর। চুরি করে পেট চালাই আমার নিজের তখন ঘেন্নায় আমার আর ছায়া মাড়াতে চাইবে না। তাইতো পালিয়ে এসেছিলাম বস্তিতে।

কিন্তু এখানেও সেই শিক্ষা দীক্ষা ভদ্রতার কথা। কিন্তু এগুলোর কি প্রয়োজন আমাদের ? খেতে দেয়, পরতে দেয়, না মানুষের মত বাঁচবার সুযোগ দেয় এগুলো ? ভদ্র বংশের ছাপ, বি, এ ডিগ্রি, সাধুতা সততা—দিচ্ছে খেতে তোমায় ? পেরেছ বাঁচাতে মাকে ? না, পারবে বোনকে বাঁচাতে ? পারবে না। সেদিন তোমার মত আশা-আকাঙ্খা বংশ মর্যাদা সবই তো ছিল আমার ? পারলাম না কেন বাঁচাতে স্ত্রীকে ? পারলাম কেন মৃত্যু শয্যায় তাকে একবার দেখতে ? শেষ বারের মত ? চিরকালের মত ?

চুপ হয়ে গেল নিমেষ।

তোমার বউ ছিল ? মারা গেছে ?

প্রশ্ন আসে অশেষের কাছ থেকে।

নিমেষ ভাবে নি আর সে খুলবে অতীতের এই ছেঁড়া অধ্যায় গুলো; ওল্টাবে একটি একটি করে জীবনের সব কটি জীর্ণ পৃষ্ঠা ! কিন্তু আর সে পারে না সামলাতে, কি হবে নিজের মনে মনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়ে। জানুক সবাই ! শিখুক। হালকা হোক তার মনের জ্বালা।

শোন, বউ ছিল আমার, খুব সুন্দরী। নিজেই বিয়ে করেছিলাম তাকে দেখে শুনে। কত স্বপ্ন ছিল। কত সাধ ছিল মনে। যা রোজগার করতাম তাতে স্বচ্ছন্দে চলে যেত দুজনের। আনন্দে হেসে খেলে চলে গেল একটা বছর। দিদি, জমাইবাবু, মামা, পিসেমশাই সবাই আসতেন যেতেন। আনন্দে স্ফূর্তিতে চলে গেল দিনগুলো।

সন্তান হবে মমতার। ছেলে আসছে আমাদের ঘরে আনন্দের পূর্ণতা বয়ে নিয়ে। একটার পর একটা করে গুনতে লাগলাম তার আসার দিন। ঘনিয়ে এল সময়। মমতাকে পাঠাতে হ'ল হাসপাতালে। একদিন যায়, দুদিন যায়, তিন দিন চলে গেল। লাঘব হল না মমতার কষ্ট যন্ত্রনা। ভয় পেয়ে গেছেন ডাক্তাররা ইঞ্জি

ডেলিভারি হবে না বলে। আমায় জানালেন বড় ডাক্তার— অপারেশন করতে হবে সিজারিয়ান অপারেশন। টাকা চাই অন্ততঃ শ খানেক!

চেয়ে চিন্তে ধার দেনা করে জোগাড় হল টাকা। হল অপারেশন। সন্তান হল মমতার। কিন্তু মৃত। তারপর এলো আরো জটিলতা প্রয়োজন হল আরো টাকার। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেও জ্ঞান ফিরল না মমতার। সুরু হল অবিরাম রক্তপাত। চাই সেলাইন, চাই কোরামিন, চাই পেনিসিলিন, চাই ব্লাড। বড় ডাক্তার জানালেন চাই টাকা। রোগীকে যদি বাঁচাতে চান, নিয়ে আসুন টাকা এখুনি এই মুহূর্ত্তে।

মাথা ঘুরে গেল আমার। টাকা আবার টাকা? কোথায় পাব? পাঁচটাও নেই যে হাতে। কিন্তু বাঁচাতেই হবে মমতাকে। ছুটে গেলাম পিসেমশাইর কাছে। জানালেন, বর্তমানে একেবারে খালি তাঁর হাত। ব্যবসায়ী মামার হাতও শূন্য তখন। আর দুঃখ করে বললেন দিদি—'অন্ততঃ দুটো দিন আগে যদি বলতিস্—হয়তো দিতে পারতাম কিছু। মহাজনদের টাকা দিয়ে দেওয়া হল কিনা কাল।'

ফিরে এলাম। পিসেমশাই মামা দিদি জামাইবাবু কেউ দিলেন না একটা পয়সা। তবে পরামর্শ দিতে ভুললেন না—এমন বউকে বাঁচাতেই হবে যে করে হোক।

কিন্তু বাঁচার কেমন করে? কোথায় টাকা? বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে দু'টাকা পাঁচ টাকা করে নিয়ে আর সামান্য যা কিছু ছিল বিক্রি করে জোগার হল অর্ধেক টাকা বাকী অর্ধেকটা? হাতে পায়ে ধরলাম বড় ডাক্তারের। কিন্তু উপায় নেই তাঁর। ক্ষমতা নেই কিছু। জানালেন—'বিলম্ব হলে বিপদের সম্ভাবনা। যা করার এখুনি করুণ।' ছুটে এলাম অফিসে। কাজে মন নেই। কি করে কোথায় পাব টাকা। হঠাৎ বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। গেলাম ক্যাশিয়ারের ঘরে। সিটে বসে টিফিন করছিলেন তখন তিনি।

জল খেয়ে একঠা বিড়ি ধরিয়ে গেলেন তিনি ল্যাট্রিনের দিকে। এইতো টেবিলের উপর পড়ে আছে দু'তিনখানা রেডি চেক। তুলে নিলাম একখানা। দেখলাম, চারশ টাকা কত আনার বেয়ারার চেক। ছুটলাম ব্যাঙ্কে। জমা হল চেক। পেলাম নম্বরি টিকেট। কত দেরি হবে আর ? টাকা নিয়েই ছুটতে হবে হাসপাতালে। পায়চারি আরম্ভ করলাম। একের পর এক বিদেয় হতে লাগল টাকা নিয়ে। ডাক হল আমার নম্বরের। যাক বাঁচা গেল। টাকা গুনছে পে ক্লার্ক। সসব্যস্ত হয়ে ঠিক সেসময় ছুটে এলেন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। ষ্টপ পেমেণ্ট। হাঁক পারলেন, দারোয়ান। পিছনে তাকিয়ে দেখলাম শুধু দারোয়ান নয়, পুলিশ সহ খাস ক্যাশিয়ার বাবু আমার পিছনে। কান্নাকাটি করলাম হাতে পায়ে ধরে। কোন ফল হল না। বিচার হল আমার। প্রমাণ হল অপরাধ। শুনল না কেউ আমার কথা। আমার প্রয়োজনের কথা। জেল হল আমার তিন বছরের।

এইতো ক'মাস আগে ফিরে এলাম জেল থেকে। ছুটে গেলাম দিদির বাড়ি। জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা হল সদরের সামনে।

মমতা কোথায় ? কেমন আছে জামাইবাবু ?

মারা গেছে।

মারা গেছে ? দিদি দিদি ··

ডাকতে ডাকতে যেতে চাইলাম ভিতরে। পথরোধ করে দাঁড়ালেন জামাইবাবু।

দাঁড়াও, দেখা হবে না তার সঙ্গে। একটা নগণ্য চোর আমার স্ত্রীকে দিদি বলে ডাকে এ আমি পছন্দ করি না।

ও :

টলতে টলতে চলে এলাম পিসেমশায়ের কাছে। পেলাম না প্রবেশাধিকার তাঁর বাড়িতেও।

মামা, মামাও ফিরিয়ে দেবেন আমায় ? তাই দিলেন :

ভদ্রবংশের ছেলে কুলে কালি দিয়ে জেল খেটে এসেছে। লজ্জা করে না তোমার পরিচয় দিতে?

চলে আসছিলাম। কোন কথা না বলে। কোন প্রতিবাদ না করে। মামাই ডাকলেন।

দাঁড়াও। তোমার ঘর থেকে একটা বেহালা আর একটা বিছানা পাওয়া গেছে। নিয়ে যাও।

এনে আমার সামনে ফেলে রেখে বন্ধ করে দিলেন ঘরের দরজা।

বন্ধু-বান্ধব যার কাছে গেছি। চোর চোর বলে আমায় কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছে। চোর? হ্যাঁ, চোরই হতে হবে আমাকে। চুরি করলাম ব্যাগ শুদ্ধ একজনের পঞ্চাশ টাকা। পালিয়ে এলাম এখানে। এই বস্তিতে। যেখানে ভদ্র বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনরা নেই। আছে চোর, পকেটমার, লম্পট, মাতালের দল। এখানে কেউ আমায় চোর বলবে না। জেল খেটে এলে কেউ আমায় দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেবে না। তাই তোমাদের এখানে দেখে প্রথমটায় ভয় হয়েছিল আমার। সহ্য করতে পারিনি তোমাদের।

বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠেছে নিমেষ। ও কি, চোখের কোণে তার ঘাম না চোখের জল? ওর মুখের দিকে তাকাতে পারে না অশেষ। শুধু শুনছে। শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে অশেষ। কোন্ কোন্ অপরাধে নিমেষের এই পরিনতি? কে দায়ী এর জন্যে? প্রশ্নের জবাব পায় না খুঁজে। তবে মন থেকে জড়িয়ে জড়িয়ে কটা কথা চলে আসে মুখে—

নিমেষ, তুমি আমি আমরাই চোর। চুরিই করব আমরা। জেল খাটব, তৈরি করব তুচ্ছ চোরের সমাজ। মান-সম্মান প্রতিপত্তি দরকার নেই আমাদের। জমা থাক ওগুলো রায় সাহেবদের জন্য।

আশ্চর্য। এমন মারাত্মক অস্ত্র নিক্ষেপ করল বাদল—ভেবেছিল এরপর অন্ততঃ জব্দ হতেই হবে অশেষকে। প্রথম ক'টা দিনের ফলাফল বেশ আশাপ্রদ বলেই মনে হয়েছিল ওদের কাছে। বিলাসও জয়ের আনন্দে উল্লসিত হয়েছিল খুব। কিন্তু ক'টা দিন যেতে না যেতেই উল্টো ফল দেখা যাচ্ছে একেবারে। তিলুর চল্লিশের জায়গায় এখন রোজগার হচ্ছে মাত্র পনের। কিন্তু তাতেও এতটুকু বিচলিত হলনা অশেষ। এতদিনের বাকি ভাড়া শোধ করে দিয়েছে সব। ধার দেনা যা ছিল তাও শোনা যাচ্ছে নেই আর আজকাল।

ভাড়াটা বাকি থাকলেও না হয় চলতো যাতায়াতটা, চলেছিলও বেশ। ভাড়া কবে দেবে, কেন দিচ্ছ না, এইসব ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই যেতে হত বিলাসকে। আলাপ করতে হত সুপ্তির সঙ্গে। সুপ্তি দাদার হয়ে কাকুতি মিনতি করত, সময় চাইত আর ক'টাদিনের। এ সমস্ত বেশ ভাল লাগত বিলাসের। কিন্তু এখন? সে পথও বন্ধ, তার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে কি বলে?

এর চেয়ে ভাল ছেড়ে দেওয়া সুপ্তির আশা। বাবা নেই বাড়ি, এমন মহামূল্য সময়টা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমনি। কিন্তু বাদলটা ছাড়বে না। সামান্য এ একটা বাসনা পূর্ণ হবে না বিলাসের? বিলাস তাই ওল্টাতে পারবে না বাদলের যুক্তি। সত্যি, অপূর্ব সুন্দরী কিন্তু সুপ্তি। আর তারই ভাড়াটে, তারই নাগালের মধ্যে। তাই এটা ওটা নিয়ে সুপ্তির সঙ্গে দেখা করতে ভোলে না সে। এক আধবার যায় প্রায় রোজই। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে আরো। আজকাল প্রায়ই বাড়ি থাকে অশেষ। নয়তো ঘরে বসে সুপ্তির সঙ্গে বেশ হেসে খেলে গল্প করে ভবঘুরে ঐ ছোঁড়াটা। ঐ নিমেষ। সুপ্তির ও বোধ হয় ভাল লেগেছে নিমেষকে। তা লাগবে না? বস্তিতে গড়ে ওঠা মন— ভাল লেগেছে বস্তির বাসীন্দাকেই। আগে তার সঙ্গে দেখা হলে, দু' একটা

কথা বলেছে সুপ্তি, এখন আর তাও নয়। পাশ কাটিয়ে চলে যায়। ডাকলে সারাও দেয় না কোন।

সন্দেহটা ওর অমূলক নয় মোটেই। প্রথম যেদিন অচৈতন্য সুপ্তিকে নিরব শুশ্রূষা দিয়ে সুস্থ করে তুলেছিল নিমেষ—সেইদিন থেকেই কেন যেন ওর চালচলনের ওপর একটা দৃষ্টি থাকতো সুপ্তির। কি করে, কোথায় যায়, আর কে আছে ওর—এসব প্রশ্ন ওর দাদার মত ওরও মনে এসেছে বারবার। তারপর যখন শুনেছে দাদাকে ব্যবসা শিখিয়েছে নিমেষ, রোজগারের পথ দেখিয়ে দিয়েছে, সেই থেকেই একটা নিরব শ্রদ্ধা ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠেছে ওর মনে। ফিরিয়ে দিয়েছিল রায়সাহেব, ফিরিয়ে দিয়েছিল সবাই, কিন্তু এই একটি মাত্র লোক বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়েছে তাদের। দাদা বলেছে নিমেষের ব্যবসায়তেই কাজ করছে সে আজকাল। কি ব্যবসা, কত আয় কিছুই জানতে পারেনি সে। দরকার কি তার? বেশ তো চলে যাচ্ছে এখন।

তাই শ্রদ্ধা লজ্জা সংকোচ ধীরে ধীরে কথাবার্তায় রূপ নিয়েছে অধিকার আব্দার ভালবাসায়।

নিমেষ-সুপ্তির এ ভাবান্তর লক্ষ্য করেছে অশেষ। মনে মনে হাসি পেয়েছে ওর। একদিনের চুরির টাকায় বেশ তো চলল কটা দিন। কিন্তু তারপর? অবশ্য বিকেল চারটে থেকে শিক্ষানবীশ হয়ে কাজ শিখছে নিমেষের কাছে। আর কটা দিন বাদেই—চুরি করতে হবে তাকে। আসল চুরি। যদি ধরা পড়ে যায়? তার আগেই বিয়েটা হয়ে যাক সুপ্তির। নিমেষই করুক বিয়ে। যখন সে জানতে পারবে যে তার স্বামী চোর, সান্ত্বনা দেবে তখন এই ভেবে যে চোর তার দাদাও। এছাড়া উপায় কি আর? বিলাসের শ্যেন দৃষ্টি থেকে বাঁচাতেই হবে সুপ্তিকে।

সেদিন কথায় কথায় নিমেষই পাড়ল কথাটা।

"অশেষ, আমায় চলে যেতে হবে এ বস্তি ছেড়ে।

চলে যেতে হবে ?

হ্যাঁ।

একটু থেমে বলতে আরম্ভ করে নিমেষ।

প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছিলাম মমতাকে। পণের টাকা সোনা গয়নার লোভ আমায় বাধা দিতে পারেনি সে বিয়েতে। তাই শেষ পর্যন্ত চিরকালের মত বাধা এসে সরিয়ে নিয়ে গেল মমতাকে।

হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অশেষ। বুঝে উঠতে পারে না কি বলতে চায় ও।

ভালবাসা আমার সইবে না। সইতে পারে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে নিমেষ।

ভালবাসা ? কার ভালবাসার কথা বলছ তুমি ?

তোমাদের। তোমার, তিলুর, সুপ্তির। সুপ্তির কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচতে হবে আমায়। তুমি হয়তো জানোনা অশেষ, সুপ্তিও আমায় ভালবেসে ফেলেছে মনে মনে।

বেশ তো। বিয়েই কর তাহলে।

হাল্কা করে হেসে বলে অশেষ।

বিয়ে ? আ-বার ?

ভাষা আর আসে না মুখে।

অশেষ তার দাদা, সুপ্তির অভিভাবক হয়ে প্রস্তাব করছে বিয়ের ? নিজে উপযাচক হয়ে স্নেহের একমাত্র বোনকে তুলে দিতে চাইছে একটা মাতালের হাতে ? কিন্তু না, সে তা হতে দেবে কেন ? কিছুদিন আগেও তো ওর আশা ছিল, ভরসা ছিল ভদ্র হয়ে বাঁচবার। কিন্তু কি বলছে ও ? না হয় চুরি করেছে জীবনে একবার। আবার মনে মনে হাসি আসে ওর। সেও তো চুরি করেছিল একবারই। অশেষ টাকা নিয়ে পালাতে পেরেছে, উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে তার। কিন্তু নিমেষের তো তাও হয়নি। তবে ? কেনই বা পারবে আর সে দাঁড়াতে ? দাঁড়াতে অন্য দশজনের মত। নিমেষ বুঝতে পেরেছে

অশেষকেও চলতে হবে গা ঢাকা দিয়ে। সন্ধ্যার অন্ধকারে। নয়তো ট্রামে বাসের ভিড়ের স্তূপে।

তবু বল্‌লে সে—

না, তা হয় না অশেষ—

কেন নিমেষ?

চুরি করেছ তুমি। তোমায় দুর্ভোগ ভুগতে হবে তার। তাই বলে একটা নিষ্পাপ প্রাণ কেন সারাজীবন দিয়ে মূল্য মেটাবে তোমার পাপের?

অশেষ কি বলবে এরপরে? কি বলার আছে তার? তবু বলে—

কিন্তু কি আর আমি করতে পারি বল? তুমি চুরি করার অনেক আগে দিদির বিয়ে হয়েছিল তোমার। তবু জামাইবাবু চোর বলে তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন। দেখাকরতে দেননি দিদির সঙ্গে একটি-বার। আর আমি? বোনকে গ্রহণ করার দরখাস্ত নিয়ে দোরে দোরে ঘুরলে কে একবার ভুলে তাকিয়ে ভালমানুষী দেখাবে বলত?

দৃঢ় সহজ কণ্ঠে জবাব দেয় নিমেষ—

তাই যদি নাই পারবে তুমি, বিলাস এর দৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছ কেন? হয় হোক—যা আছে ওর অদৃষ্টে। ছেড়ে দাও সব।

অশেষ লক্ষ্য করে কণ্ঠস্বরে ওর শ্লেষ বিরক্তি। লক্ষ্য করে ওর মুখের ভাবান্তর। আশ্চর্য এই লোকটা। ভাবে, জবাব দেবে না এর। কি দরকার! যা হবার তাতো হচ্ছেই। হোক—আরো যা বাকি আছে। কিন্তু নিমেষের দৃষ্টি কথা কেড়ে নেয় ওর মুখ থেকে।

বিলাস লম্পট।

আর আমি? মাতাল। বিলাস বড়লোক—আর আমি চোর।

কিন্তু তবু তুমি মানুষ, অন্তর নেই বিলাসের। সে দেবে না বিয়ের অধিকার। চায় লুটে নিতে।

তবু ওকে ছেড়ে দেয় না নিমেষ। সত্যিকারের ভালবেসেছে

সুপ্তিকে। তাই বিয়ে করে প্রবঞ্চিত করতে চায় না তাকে। হারাতে চায় না ওর মনের গোপন শ্রদ্ধাটুকু।

বেশ, ছেড়েই দিলাম বিলাসের কথা। আরো ত পাত্রের অভাব নেই আশে পাশে। হোক না তার বয়েস যাট, থাকুক না তার টি, বি, সেতো চোরও নয় মাতালও নয়। পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে না তাকে। উঠতে বসতে সকালে বিকেলে থু থু দেবে না সবাই। দেখ না তেমন একটি পাত্র।

অশেষ বাড়াতে চায় না কথা। ওর কাছ থেকে অন্ততঃ পেতে চায় না এমনি নির্মম আঘাত।

তোমাকেই বিয়ে করতে হবে নিমেষ। তুমি হতে পার চোর মাতাল সবকিছু। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এই, তোমার ভাল লেগেছে তাকে। সেও ভালবেসেছে তোমায়।

কিন্তু সে যখন জানবে যে আমি চোর—একটা নগণ্য চোর। একটা হীন মাতাল ?

অহেতুক চীৎকার করে ওঠে নিমেষ।

পিসিমণি পিসিমণি,

হাঁপাতে হাঁপাতে একটা ঠোঙ্গা হাতে করে এসে প্রবেশ করল তিলু। ঠোঙ্গাটা খুলে ফেল্‌ল সুপ্তি। তিনটে কাটলেট আর দুটো চপ। সহাস্যে প্রশ্ন করল সে—

কিরে, চুরি করে নিয়ে এসেছিস নাকি এগুলো ?

না, না বলে তুলে নিয়ে এসেছি।

না বলে ?

হ্যাঁ।

তিলু দেখল কেমন হয়ে গেল পিসিমণির মুখখানা। তার না বলে তুলে আনার কৈফিয়ৎ দিতে আরম্ভ করল একে একে। দু' মাসের ওপর হয়ে গেছে তার চায়ের দোকানের চাকরি। যা সে অগ্রিম নিয়েছিল পাঁচটা টাকা। তারপর আর তার মাইনে বাবদ একটা পয়সা ছোঁয়ায়নি দোকানের মালিক। অপরাধের মধ্যে সে আজ চেয়েছে তার মাইনের টাকা। অন্ততঃ একমাসের টাকাটা তার হাতে দিলেও তো চলত। সে পীড়াপীড়ি করেছে তাই।

দুদিন বাদেই না হয় নিতিস টাকাটা।

বললে সুপ্তি।

কিন্তু তিলু লক্ষ্য করেছে আজ কটা দিন ধরে অভাব অনটন আবার বেড়ে উঠেছে সংসারের। কিন্তু সুপ্তির প্রশ্নের জবাব দেয় সে একটু ঘুরিয়ে।

ওকি আর দিত নাকি? ছাই দিত। কত লোককে তো রেখেছে এর আগে। কাউকে মাইনে দেয়নি শুনেছি। তারপর আবার যাচ্ছে-তাই বলে বাপ মা তুলে গালাগালি। আমি সহ্য করব কেন?

সুপ্তি বুঝল বাপ মা তুলে গালাগাল দিতে চটেই গেছে তিলু। যে বাপ ওকে সন্তানের অধিকার দেয়নি একদিনের জন্যে, যে বাপ সত্যিকারের দুশ্চরিত্র মাতাল, তাকে বলতেই সবচেয়ে বেশি লেগেছে ওর। বাপ তার সন্তানের কাছে কত প্রিয়; কত বেশি মূল্যবান তাতো তবু জানতে পারে নি তিলু। জানলে হয়তো একটা ফৌজদারি করে বসত দোকানের মালিকের সঙ্গে। শুধু মাত্র প্রতিবাদ করেছে সে। ফাঁক পেয়ে কটা চপ কাটলেট তুলে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। পালিয়ে এসেছে সেখান থেকে যেখানে একবার দোষ কীর্তন করা হয়েছে ওর বাপের।

বাপ মা তুলে গালাগাল দিয়েছে, চাকরি গেছে—তাতে যতটা দুঃখ হয়নি, তার চেয়ে বেশী দুঃখ হল তিলুর—না বলে তুলে আনা

চপ কাটলেট পিসিমণি খাবে না বলে। খাবে না কেন? এত আর সে সত্যি সত্যি চুরি করে আনে নি। দোকানের মালিকটা যে মেরে দিল তার দু মাসের টাকা। তাতে দোষ হল না? যত দোষ হল বুঝি তার? জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল তিলু চুপ করে।

স্বপ্তির দুঃখ হল ওর জন্যে। সত্যি, ওতো আর চুরি করে আনে নি।

বেশ, আমি খাব। কিন্তু এমনি না বলে আর কোনদিন তুলে আনবি না বল?

আমি বলেছি নাকি তুলে আনব? আর আমার ভারি দায় পড়েছে!

বলতে বলতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো তিলু—

পিসিমণি, ঐ দেখ সেই লোকটা। সেই যে আমার চাকরি খেয়েছিল।

স্বপ্তি দেখল বিলাস আসছে তাদেরি ঘরের দিকে। চট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

স্বপ্তি......স্বপ্তি।

ডাকতে ডাকতে ঘরে প্রবেশ করল বিলাস। চার পাঁচবার ডাকল সে। কিন্তু ঘরে চুপটি করে বসে আছে তিলু।

হ্যাঁরে, জবাব দিচ্ছিস না কেন?

জবাব দেব কেন? আমার নাম কি স্বপ্তি নাকি?

ডেকে দে স্বপ্তিকে।

পারব না। আমি কি তোমার চাকর?

বলে কি ছোঁড়াটা! বিলাসের ইচ্ছে হল একটা চাটি মেরে খুলে ফেলে ওর সব কটা দাঁত। কিন্তু কাজ আদায় করতে হলে চটলে শুধু চলে না সব সময়। খোসামুদি করতে হয় মাঝে মাঝে। দিল একটা টাকা বার করে ওর হাতে।

এই নে।

খুসী মনে নিল তিলুটাকাটা। তক্তপোষের উপর বসিয়ে দুখানা কাটলেট আর এক গ্লাস জল এনে রাখল ওর সামনে।

এসব কি ?

পিসিমণি রেখে গেছে। খেয়ে নিন্ চট্ করে।

বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। মনের আনন্দে খাচ্ছে বিলাস। চোখে মুখে ফুটে উঠেছে বিজয়ের চিহ্ন। ছোট জাত, বস্তির ছেলে। দুচার আনা খরচা করলেই কাজ আদায় হয় ওদের কাছ থেকে। খেয়ে দেয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে একটা সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল স্বপ্তির জন্য। কিন্তু কোথায় স্বপ্তি ? হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এল তিলু।

কিরে, কোথায় তোর পিসিমণি ?

বেড়াতে গেছে।

বেড়াতে গেছে ? কোথায় ? কার সঙ্গে ?

কোথায় তাতো জানিনে। তবে ও ঘরের নিমেষকাকুর সঙ্গে।

রাগে লাল হয়ে ফুলে উঠলো বিলাস। তিলু এক টাকার ভাঙ্গানি হাতে করে এগিয়ে এল ওর সামনে।

এক টাকা দিয়েছিলেন তো ? এই নিন চার আনা ফেরৎ।

কিসের ফেরৎ ?

আশ্চর্য হয়ে যায় বিলাস।

ছ আনা করে কাটলেট দুখানার দাম বার আনা।

দাম দিয়ে কাটলেট ? স্বপ্তি দেয় নি তাহলে ?

আজ্ঞে না। পান বিড়ির সঙ্গে সঙ্গে আমার কাজটাও আপনারা খেয়েছিলেন, মনে নেই ? তাই তো আমায় এখন কাজ করতে হয় চায়ের দোকানের বয় এর। পরিবেশন করে পয়সা নেওয়া আমার চাকরি।

একটা চড় কষিয়ে দিল ওর গালে। জ্ঞানহারা বিলাস।

এক পাটি খড়ম ছুঁড়ে মারল ওর দিকে। প্রতিহিংসাপরায়ণ তিলু।

দ্রুত বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। ছুটে প্রবেশ করল সুপ্তি।

তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে এতবড় অপমান আমায় সহ্য করতে হল।

নালিশ জানাল বিলাস।

উত্তর আসে না সুপ্তির কাছ থেকে।

এত সময়ে সামলে নিয়েছে বিলাস। আজ তাকে মন খুলে সব কথা বলতেই হবে সুপ্তির কাছে। জানাতে হবে তার দাবি। জানতে হবে সুপ্তির মত।

সুপ্তি, বারবার আমাকে তোমার কাছে ছুটে আসতে হয়। তুমি কি বোঝ না। আমি কেন আসি ?

এবার জবাব আসে সুপ্তির।

সত্যি। আমি বুঝতে পারি না কেন আসেন আপনি।

শুধু তোমার কাছে। তুমি বিশ্বাস কর সুপ্তি, শুধু তোমার কাছে।

তাই যদি হয় তাহলে অপমান ত আপনার প্রাপ্য।

কি বলছ তুমি সুপ্তি ?

কি অধিকার আছে, কি প্রয়োজন আছে আপনার আমার সঙ্গে দেখা করবার ?

ও, যত অধিকার বুঝি নিমেষেরই ?

জবাব দেয় না সুপ্তি।

তাই তার মত একটা লোফারের সঙ্গে গল্প করতে আটকায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে প্রেমালাপ করা যায় একটা বেকার ভবঘুরে ছোঁড়ার সঙ্গে।

তাই যদি জানেন তবে আর তাকে অপমান করার অধিকার নেই আপনার।

অধিকার, অধিকার, অধিকার। কি অধিকার আমার আছে না আছে তা তোমায় আজ আমি কি করে বোঝাব সুপ্তি? বুঝবে সেদিন, যেদিন দুনিয়া থেকে সরে যাবে—ঐ লোফারটা নয়তো জমিদারের ছেলে, এই বিলাস।

সেদিনের খুব দেরিও নেই আর। তাই না বিলাস বাবু?

প্রশ্ন করে নিমেষই নিজে। অনেক আগে থেকেই সে এসে শুনছিল ওদের কথাবার্তা। দুজনের অলক্ষ্যেই।

ঠিক তখনকার মত উত্তর খুঁজে পায় না বিলাস।

হাসতে হাসতে নিমেষই বলতে থাকে আবার।

ঐ লোফারটা কিন্তু সহজে সরে যাবে না বিলাসবাবু। কারণ তার ভাগ্য ভাল যে তার মত একটা লোফারের প্রেমের প্রতিদ্বন্দী হচ্ছেন জনৈক উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্তবংশীয় ভদ্রযুবক।

রাগে ফুলতে ফুলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বিলাস। সুপ্তিও চলে যেতে চায় মাথা নিচু করে। নিমেষ ডাকল, সুপ্তি।

দাঁড়াল সুপ্তি। কিন্তু কোন কথা চট করে এল না নিমেষের মুখে একটু এগিয়ে গেল তার কাছে! আস্তে আস্তে বল্‌লে তারপর,

সত্যি, সত্যি আমি একটা লোফার সুপ্তি। লোফার হয়েও বাঁচতে চাই বাকি জীবনটা! তুমিও কি আমায় ঘৃণাই করবে চিরকাল?

টুপ করে সুপ্তি ওর পায়ে একটা প্রণাম করল শুধু।

বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যা! এবস্তি-বাসিরা আর যাই হোক, হিন্দু তো।

পূঁ—উ—উ, পুঁ—উ—উ, পু-উ

ঘরে ঘরে বেজে উঠল শাঁখ।

চোর, চোর, চোর !

ডালহৌসির কর্মব্যস্ত জনবহুল একটা রাস্তায় চোর ধরা পড়েছে একটা ! সবাই মিলে পিটছে লোকটাকে। কে কাকে পিটছে, কে কি বলছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না ভাল করে। শুধু হৈ হৈ মারমার শব্দ। হঠাৎ একটা লোক হন্ত দন্তহয়ে ছুটে এল। মাথা গলিয়ে দিল ভিড়ের মধ্যে। তারপর আবার মারমার শব্দ। ভিড়টা গোল হয়ে এগিয়ে গেল প্যায়ে পায়ে। তারপর কোথায় চোর ? আর কোথায় কে ? ছুটতে আরম্ভ করল কেউ এদিকে কেউ ওদিকে। কেউ কেউ জটলা করতে লাগল সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকেই।

কি হয়েছিল ?

প্রশ্ন করে ভিড়ের মধ্যে সবার শেষে পালিয়ে যাওয়া সেই লোকটা।

আর বলবেন না মশাই পকেট থেকে চুরি। স্রেফ উধাও, মনিব্যাগ শুদ্ধ ! কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার। ভিড়ের মাঝখান থেকে কেমন সট্‌কে গেল লোকটা দেখলেন তো ?

মাঝখান থেকে বলে কে উঠল,

জানেন না মশাই ইন্টারন্যাশনাল গ্যাং আছে ওদের। মন্তর তন্তর ধুলোপড়া হিপ্নোটিজ্‌ম্ সব জানে ওরা।

কেউ পরামর্শ দিল, ফাঁসী দেওয়া উচিত।

কেউবা বল্‌ল—গুলি করে মারা উচিত এদের।

আপন আপন মতামত প্রকাশ করে আস্তে আস্তে যে যার ঘরের দিকে যাত্রা করল একে একে ! সেই পালিয়ে যাওয়া লোকটা নিজের মনেই তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হাসি হাসল আর একবার। তারপর পা চালিয়ে দিল দ্রুতবেগে। সোজা চলে এল বস্তিতে।

অশেষ, অশেষ ···এই যে সুপ্তি, তোমার দাদা আসেনি এখনও ?

দাদা ? নাত।

আসেনি ? ও,—কেমন একটু চিন্তিত হয়ে ওঠে নিমেষ।

ভয় হল সুপ্তির। দাদা কোথায়, কি হয়েছে তার ? এমন চিন্তিত হয়ে বসে পড়ল কেন নিমেষ ?

নিমেষই আবার হাল্কা করে দেয় কথাটা।

না না, ও কিছু নয়। এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম। যাক্‌গে, এককাপ চা খাওয়াও, অনেক ঘুরে এসেছি।

চা করতে চলে গেল সুপ্তি।

একটু বাদে ছুটতে ছুটতে এসে প্রবেশ করল অশেষ। চোখে মুখে ওর অপরাধের সুস্পষ্ট ছাপ। কথাবার্তায় একটা অনাগত বিপদের ভীতি।

নিমেষ, এই নাও টাকাটা। সুপ্তিকে দেখো। আমি ধরা পড়ে যাব বোধ হয়। অনেকগুলো লোক ফলো করছে আমায়।

যাঃ, কেউ ফলো করছে না। যে যার নিজের নিজের কাজে যাচ্ছে। বোস চুপ করে।

নির্ভয় করে তুলতে চায় নিমেষ।

আশ্চর্য হয়ে যায় সে। একি ওর মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ কেন ? ঠিক সেই সময় চা নিয়ে প্রবেশ করেছে সুপ্তি। চমকে উঠল সে।

একি, তোমার মাথা কি করে কাটলো দাদা ?

জবাব দেয় না ওরা কেউ। অস্থির হয়ে ওঠে সুপ্তি।

কি হয়েছে দাদা ? কারো সঙ্গে মারামারি করোনি ত ?

না সুপ্তি।

তবে ?

মার খেয়েছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। অনেকগুলো লোক আমায় মেরেছে। ডাক্তারখানায় গিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে নিয়ে এসেছি তাই

কেন, কেন মেরেছে তোমায় ?

টাকা চুরি করেছিলাম বলে।

চুরি ?

হ্যাঁ চুরি।

কি করছ অশেষ ?

বাধা আসে নিমেষের কাছ থেকে।

বাধা দিও না নিমেষ। আজ বলতেই হবে আমায়। বলে বলে হাল্কা করতে হবে নিজেকে।

সত্যি সে বললো সব। কি করে শোধ দিয়েছে সমস্ত দেনা। কি করে চুরি করেছে রায় সাহেবের টাকা। চুরি না করে কি উপায় ছিল তার ? এতদিনে মরে ভূত হয়ে যেত সুপ্তি, সে, সবাই। চুরি তাকে করতে হবে তাই। যতদিন সে বাঁচবে। জেল হবে। ছাড়া পাবে, আবার চুরি করবে। তৈরি করবে সে তারি মতো আরো ছোট ছোট চোর। দেশ ভর্তি বড় চোরদের আসন টলে উঠবে তাদের মিলিত প্রচেষ্টায়।

বারবার বাধা দিল নিমেষ। কিন্তু আজ অশেষ ক্ষেপে গেছে খুব। বলল সব। চুপ হয়ে গেল নিমেষ সুপ্তি। কেউ মুখ তুলে চাইতে পারছে না আর।

জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অশেষের সমস্ত স্বীকারোক্তি একমনে শুনলো বাদল। সে এসেছিল বিলাসের হয়ে নূতন কোন ফন্দি নিয়ে। শায়েস্তা করার এমন একটি ভাল খোরাক পেয়ে গেল সে এইখানেই। রাস্তায় গিয়ে একটা দোকান থেকে ফোন করল থানায়—

হ্যালো, একটা চোর। অশেষ নাম। এসে বাসা বেঁধেছে আমাদের বস্তিতে। ব্যাগ শুদ্ধ টাকা চুরি করেছে আমারি পকেট থেকে। এক্ষুনি চলে আসুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জমিদারের ছেলে বিলাস কথা বলছি। হ্যাঁ, চলে আসুন এক্ষুনি।

বিলাসের নাম করে ফোন শেষ করে হাসিমুখে চলে এল সে বিলাসের কাছে।

মুখরিত হয়ে উঠেছে বাদল। পুলকিত হয়েছে বিলাস।

আর অচঞ্চল মৌনতা বিরাজ করছে ইতিমধ্যে অশেষদের ঘরে। সুপ্তি কি শুনলো এসব? তার দাদা চোর। বাবার সেই আশা আকাঙ্ক্ষা—মায়ের সেই নিরব আত্মাহুতি এমনি করে নষ্ট হয়ে গেল সব? দাদার বংশ মর্যাদা, শিক্ষা দীক্ষা মিথ্যা হয়ে গেল এতদিনে?

আর মাত্র দুটো দিন আগে যার কাছে স্বয়ংবরা হয়েছে, সেই নিমেষ? সেও চোর? তার দাদার শিক্ষাগুরু?

কিন্তু আজ আর চোখে জল আসছে না সুপ্তির। খেই হারিয়ে ফেলেছে সে। কি বলবে? কাকে বলবে? কোথায় আছে তার সত্যিকারের আশ্রয়? কি সে করবে, কি করবে না—কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না সুপ্তি।

নিমেষ ও জীবনে এমনি করে বোবা হয়ে যায় নি এর আগে কোনদিন। সমাজ সংসার পরিত্যাগ করে ছুটে এসেছিল এখানে। আবার কি ফ্যাসাদ বেঁধে গেল একটা। নারীর সংস্পর্শে সে আসতে পারবে না—এই তার বিধিলিপি—এল জীবনে মমতা, কোথায় চলে গেল! অনেক আত্ম-কলহের পর গ্রহণ করল সে সুপ্তিকে, কোথায় মিলিয়ে যাবে কে জানে?

আর অশেষ? জানালায় দাঁড়িয়ে আছে পেছন ফিরে। সে আর ভাবছে না কিছু। ভাবতে পারছে না। মাথায় তার অসহ্য যন্ত্রনা। কাটা ঘায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে ডাক্তার। গরম জল, তুলো, ইন্‌জেক্‌সন্—বাকি ছিলনা কোনটা।

ব্যাণ্ডেজ খোলা হবে, ঘা শুকিয়ে যাবে, দাগ মিলিয়ে যাবে একদিন। কিন্তু মাথার এ যন্ত্রনা তার আর বন্ধ হবে না। ঘা শুকিয়ে যাবে না, দাগ মুছে যাবে না কোনদিন। এই ক্ষত চিহ্ন নিয়ে বাঁচতে হবে তাকে, চলতে হবে তাকে পথ। অচঞ্চল, স্থির, অপলক অশেষ তাই দাঁড়িয়ে।

একি ?

হঠাৎ কেঁপে উঠলো কেন বুক ? চঞ্চল হয়ে উঠলো অশেষ।

একবার ডাকল—"সুপ্তি"।

বলল না কিছু তাকে।

"নিমেষ", আবার ডাকল সে।

দুজনের দুখানা হাত নিয়ে এক করে দিল। একবার সুপ্তির আরবার নিমেষের মুখের দিকে তাকাল ও। অগ্নি নয়, শালগ্রাম নয়, তার ভগ্নি সম্প্রদানের, এ মিলনের সাক্ষী রেখে গেল ওরই নিজের কয়েক ফোঁটা চোখের জল।

ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল খিরকীর দরজা দিয়ে। সব কাজ সে শেষ করে ফেল্‌ল মিনিট কয়েকের মধ্যে।

ওরা দেখল সশব্দে সাড়ম্বরে বিজয় অভিযানে আসছে পুলিশ।

এসে গেছে। এল।

তচনচ করে উল্টে পাল্টে সব জিনিস দেখা হয়ে গেল। এদিক সেদিক ঘরে বাইরে বাকি থাকল ন কিছু। সদর্পে প্রবেশ করে বেরিয়ে গেল আবার সদর্পে। আসামী ধরা পড়ল না। সুপ্তি সরে গেছে ঘর থেকে। নিমেষেই সব দেখিয়ে শুনিয়ে সাহায্য করেছে পুলিশকে।

রাস্তায় প্রশ্ন করে বিলাস।

কি মশায় ধরা পড়ল না আসামী ?

পালিয়ে থাকবে কোথায় ? আজ হোক, কাল হোক ধরা পড়তেই হবে বাছাধনকে।

জবাব দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে দেয় পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্‌টর।

আর ধৈর্য্য রাখতে পারে না সুপ্তি। কেঁদে ফেল্‌ল নিমেষের সামনে।

কি হবে ? দাদার জেল হবে সত্যি ?

তুমি ভেবনা, আমি চেষ্টা করব সুপ্তি।

নিমেষ যাবে তার পরিচিত উকিলের কাছে। সত্যি যদি ধরা পড়ে যায় অংশুষ, যাতে বেল করান যায় কোন রকমে, সেই চেষ্টা করবে সে।

কিন্তু সুপ্তির আজ সকাল থেকে খাওয়া হয়নি কিছুই জানে সে। ব্যাগ খুলে তার সামনে ধরল একটা পাঁচ টাকার নোট।

আমি উকিলের বাড়ি যাচ্ছি। তিলু এলে কিছু খাবার আনিয়ে নিও।

টাকা ধরে না সুপ্তি। দাঁড়িয়ে থাকে মাথা নিচু করে।

নাও, টাকা নাও।

চুরির টাকা জীবন থাকতে আমি আর গ্রহণ করব না।

ও: বেশ,

আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায় নিমেষ।

চুরির টাকা নিল না সুপ্তি। কিন্তু খাবে কি সে? জীবনে কোনদিনই আর তাহলে সে গ্রহণ করবে না অন্নজল? দেখা হল গেটের সামনে তিলুর সঙ্গে।

তিলু শোন্?

দাঁড়াল তিলু।

এই নে। এই টাকাটা রাখ। কিছু খাবার নিয়ে এসে খাবি তুই আর তোর পিসিমণি, কেমন?

আচ্ছা।

আর হ্যাঁ, আমি টাকা দিয়েছি, এ কথা বলিস নি যেন তোর পিসিমণির কাছে।

না, না। অত কাঁচা ছেলে নাকি আমি? আমি বলব ও আমিই ম্যানেজ করে নিয়ে এসেছি—এদিক সেদিক থেকে।

খুশি মনে নোটটা আর একবার ভাল করে দেখে নিয়ে যাত্রা করল তিলু খাবারের দোকানের উদ্দেশ্যে। আর নিমেষ রওনা হল উকিলের বাড়ির দিকে।

অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে বিলাস আর বাদল। এই সুযোগ, এই সুযোগ তাদের। বাদলকে ইসারা করে বিলাস। চলে গেল সে রাস্তার দিকে। বিলাস এসে প্রবেশ করে ঘরে। সুপ্তিদের ঘরে।

তোমাদের এত বড় বিপদ—আমাকে একটা খবর দেবে তো? আমি ত প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি নিজের চোখকে। অশেষকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। এ কি করে বিশ্বাস করি সুপ্তি?

ধরে নিয়ে গেছে?

আর্তনাদ করে ওঠে সুপ্তি।

যাক, আমার বাবা জাজ। তাঁর কাছে গিয়ে খুলে সব বলতে হবে তোমাকে। একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবেন তিনি।

প্রথমটায় আশার আলো দেখতে পেল সুপ্তি। কিন্তু পরক্ষণেই দমে গেল সে। বিশ্বাস করা উচিত হবে না বিলাসের কথায়। হোক চোর, হোক আসামী, মিথ্যেবাদী নয় তার দাদা। বিলাসের সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছে সে তাকে। আর যাই হোক না কেন অসচ্চরিত্র নয় অশেষ। আর বিলাস? তাকে সে চিনে নিয়েছে এতদিনে।

বিলাস কিন্তু অনেক করে বোঝাল সুপ্তিকে। তাতে তাদেরই উপকার। ওরা তাদের ভাড়াটে বলেই এত করে বলছে বিলাস। নয় তো কি দায় পড়েছে তার?

হাতে পায়ে ধরে সব বল্‌লে বাবা নিশ্চয়ই তোমার কথা রাখবেন। চল আমার সঙ্গে।

না, তিনি তো কোলকাতায় নেই আমি জানি।

প্রথমটায় কি রকম ফ্যাকাসে হয়ে গেল বিলাসের মুখ। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে সে বল্‌ল।

বর্তমানে কলকাতায়ই আছেন তিনি।

অনেক যুক্তি, অনেক কথা। কোনটাই ধোপে টিকল না সুপ্তির কাছে।

বিলাস ফাঁদল নূতন ফাঁদ।

প্রেম, ভালবাসা এসব কি মিথ্যা স্বপ্তি? তোমার এতবড় বিপদে আমাকেই থাকতে হবে তোমার পাশে। আমার সমস্ত চেষ্টা দিয়ে বাঁচাব তোমাকে—তোমার দাদাকে। স্বপ্তি, স্বপ্তি··· ··

আরো কত কথা। কত ভাষা। প্রেমে গদগদ কণ্ঠস্বর। কিন্তু শুনছে কে? শুনবে কে? এমনি করে এতকথা কোনদিন বলেনি নিমেষ। কিন্তু তবু সে ঢেলে দিয়েছিল তার সমস্ত অন্তর নিমেষেরই পায়ে। কান খাড়া ছিল তার সব কটি কথা শোনার আগ্রহে। 'হরিবোল্' শুনে ভাবে-ভক্তিতে চোখে জল আসে ভক্তের! আকুল হয়ে ওঠে সে নামগানের অপূর্ব মাদকতায়। কিন্তু 'বল হরি হরিবোল' তার কাছে আনে ত্রাস, আনে মৃত্যুর বিভীষিকা। তাই সে পছন্দ করে না সে নাম। দূরে দূরে সরে থাকতে চায়—সে নামের ধার কাছ থেকে।

ধীরে ধীরে ভীষণ থেকে ভীষণতর হতে লাগলো বিলাসের মুখ। স্বপ্তির মত মেয়েকে এত সহজে বশ মানান যাবে না, বুঝল সে। বাইরে উঠেছে প্রলয় ঝড়। বিলাসের মনে একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা। একটা বীভৎস আলোড়ন।

যেতেই হবে তোমাকে।

না, আমি যাব না!

যাবে না?

ওর পৈশাচিক হাসিতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল স্বপ্তির। হাতের সিগারেটের টিন, মাথার ফেল্ট ছুড়ে ছুড়ে মারল বিলাস।

যাবে না? অনেকদিন তুমি যাওনি। কিন্তু আজ···আর আমি যাব না ফিরে।

বাইরের প্রচণ্ড হাওয়ায় নিভে গেছে ঘরের আলো। আক্রমণ করেছে বিলাস।

চীৎকার করে উঠলো স্বপ্তি। ঝড় নয়, ঘূর্ণিবাত্যা নয়, ভীষণ ভূমিকম্পে পায়ের মাটি সরে যাচ্ছে কোথায়। হৃদস্পন্দনের প্রচণ্ড দোলায় দুলতে দুলতে আটকে গেল সে বিলাসের হাতে।

অগভীর রাত্রের অন্ধকারে টানতে টানতে জোর করে নিয়ে চলল বিলাস। কেউ বাধা দিল না। কেউ প্রতিবাদ করল না কোন। ঘরের দরজা বন্ধ করে চুপ করে রয়েছে যে যার। পুলিশ এসেছে তারা জানে। ঝড় উঠেছে তারা দেখেছে। তাই শয্যা নিয়েছে সবাই। কেউ ভয়ে, কেউ আলস্যে।

খাবার নিয়ে ছুটতে ছুটতে আপন মনে ফিরছিল তিলু। বিলাস সদর পেরিয়ে যায়নি তখনো।

একি! পিসিমণিকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছ কেন?

বাধা দিতে চেষ্টা করল 'প্রাণপণ শক্তিতে।

একটা লাথি মেরে ওকে ফেলে দিলে বিলাস। পড়ে গেল তিলু মাটিতে।

সদরের সামনে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে বাদল। জোর করে বসিয়ে দেওয়া হল স্বপ্তিকে।

গা ঝেড়ে ততক্ষণে উঠে বসেছে তিলু। দেখল পকেটে রয়েছে তার আগের বাকি চার টাকার মত। ঐ তো ছেড়ে দিচ্ছে, প্রায় ছেড়ে দিল গাড়িটা পিসিমণিকে নিয়ে। ওর সামনে থেকে একটা শয়তান ধরে নিয়ে যাবে পিসিমণিকে? ছুটে গিয়ে বসে পড়ল পেছন-দিককার বাম্পারের ওপর। চল্‌ল গাড়ি বিজয়গর্বে—জল কাদা ছিটিয়ে।

থাকল পড়ে তিলুর হাতের খাবার—ওদের ওই নিরব অভিযানের একমাত্র সাক্ষী হয়ে।

স্বপ্তি, স্বপ্তি।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আস্তে আস্তে খোলা দরজা দিয়ে প্রবেশ করছে ঝড়ে বাদলে ভেজা আহত অশেষ। পুলিশের ভয়ে পালিয়েছিল সে। রাত থাকতে থাকতেই আবার গা ঢাকা দিয়ে চলে যেতে হবে তাকে। স্বপ্তির বিয়ের আগে পুলিশের হাতে ধরা দিতে পারবে না সে, কিছুতেই না।

স্বপ্তি, ঘুমিয়ে পড়েছিস্ বুঝি ?

জ্বালাল আলোটা। কিন্তু কোথায় স্বপ্তি ? শূন্য ঘর। ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে।

স্বপ্তি, স্বপ্তি-ই-ই।

কিন্তু কোথায় স্বপ্তি ? নিদ্রিত বস্তি। রাত্রির নিস্তব্ধতা। মেঘে মেঘে কালো আকাশের রূপ। থমথমে ভাব। ভয় হল, সন্দেহ হ'ল ওর। ছুটে এল নিমেষের ঘরে।

নিমেষ, নিমেষ .....

কোন সাড়া নেই।

নিমেষ, স্বপ্তি কোথায়, স্বপ্তি ?

কোন সাড়া নেই। ও, এত সময় লক্ষ্যই করেনি যে বাইরে থেকে তালাবন্ধ নিমেষের ঘর। কিন্তু কোথায় স্বপ্তি ? নিমেষের সঙ্গে গেছে ? কিন্তু কোথায় যাবে এত রাত্রে ? না সেই শয়তান ? ফিরে এল ঘরে।

সেই শয়তান। আর কোন সন্দেহ থাকে না অশেষের, সেই শয়তান। স্বপ্তি যদি এমনি করে চুরি হয়ে যাবে, তাহলে কেন সে বিসর্জন দিয়েছে নিজের চরিত্র ? কেন সে চুরি করেছে অপরের ছুটো পাঁচটা টাকা ? কেন তাকে গা ঢাকা দিয়ে চলতে হবে চিরকাল ?

একটার পর একটা প্রশ্ন আসছে, যাচ্ছে। উত্তর নেই তার, থাকবে না কোনদিন।

তন্নতন্ন করে দেখছে সে তার নিজের ঘর। ঐ, ঐ তো পড়ে রয়েছে সেই শয়তানের মাথার ফেল্ট। এই তো, সিগারেটগুলো পায়ের চাপে চাপে ছড়িয়ে রয়েছে সারা ঘরময়। প্রতিহিংসায় বীভৎস হয়ে উঠে তার মুখ। প্রতিশোধ নিতে হবে। প্রতিশোধ। সে চোর। খুনী হতে হবে তাকে। খুন করবে সে ঐ শয়তানকে। কিন্তু কোথায় নিয়ে গেছে সুপ্তিকে? কোথায়?

কিন্তু পাবে কোথায় অশেষ সুপ্তিকে? সে কি করে জানবে যে কলকাতা থেকে বেশ কিছুদূরে বন্দিনী সুপ্তি। জেনেছে তিলু—কোথায় এসে ঢুকেছে গাড়িটা। ওপরে নিয়ে গেছে পিসিমণিকে। অনেক সময় সে বসে থাকল গাড়ির সিটে। ওপর থেকে তার কানে ভেসে এল নাচগানের শব্দ। একা এখন কি করবে সে? পিসিমণিকে ছেড়ে চলেও যেতে পারে না, যাবে না। ভাবতে ভাবতে গাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়ল তিলু।

ওপরে নাচগানের সঙ্গে সব রকমের আনন্দ চলেছে বিলাসের। বিলাস, বাদল, বন্ধু জুটেছে আরো কটি। নাচছে একটি মেয়ে। তালে তালে ওরা খাচ্ছে মদ।

পাশের ঘরে সুপ্তি, বন্দিনী সুপ্তি। বাইরে থেকে তালা দিয়ে রেখেছে ঘরে। বসে বসে কি ভাবছে ও? বর্তমান, ভবিষ্যৎ, না অতীত? তিনটেই যার সুপ্ত কান্নায় ভরা, সে আর কাঁদতে পারে না। সুপ্তি বসে আছে পাষাণ প্রতিমার মত। কি হচ্ছে, কি হয়ে গেল, আরো কি হবে, হোক। ভয় নেই কোন। বাধা নেই আর।

ভোরের আলো হতে না হতেই ঘুম ভেঙে গেছে তিলুর। চোখ মুছে আস্তে আস্তে সে বেরিয়ে এল সদরের বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবল খানিক। কোথায় এসেছে, কি করবে একা? ঐ তো একটা যাত্রিবাহী বাসের কণ্ডাক্টার হাঁকছে—শ্যামবাজার, শ্যামবাজার।

উঠে পড়ল তিলু। শ্যামবাজার। শ্যামবাজার থেকে ট্যাক্সি।
ঠিক ঐ সময় বাজার করে মাছ আর এক থলে তরকারি নিয়ে সুপ্তিদের ঘরে যাচ্ছিল নিমেষ। উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে সমস্ত ব্যবস্থা করে এসেছে সে।

কাকু, নিমেষ কাকু…

একি, ট্যাক্সি থেকে গলা বাড়িয়ে ডাকছে তিলু?

ঘ্যাচ্ করে দাঁড়াল গাড়িটা।

সর্বনাশ হয়ে গেছে কাকু। শিগ্‌গির চলুন। চুরি করে নিয়ে গেছে পিসিমণিকে।

চুরি? পিসিমণিকে? কে? কোথায়?

কাল থেকে তিলু যা যা দেখেছে বল্‌ল সব। এরচেয়ে সত্যিকারের একটা বাজ পড়ল না কেন নিমেষের মাথায়? তার ছন্নছাড়া জীবনটাকে আবার সে বেঁধেছিল সুপ্তির কাছে। তার দগ্ধ নিরাশ জীবনে আশার সঞ্চার হয়েছিল আবার। ভালবাসার স্বপ্ন, ঘর বাঁধার স্বপ্ন, কত স্বপ্ন সে দেখেছিল সুপ্তিকে নিয়ে। তিলুর কাছ থেকে শুনতে শুনতে এসব কথাই ভাবল নিমেষ। না, সে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না সুপ্তিকে। তাকে তার বড় প্রয়োজন। আনতে হবে ফিরিয়ে। পালিয়ে যেতে হবে দূরে, বহুদূরে! এই বস্তি থেকে অনেক দূরে। ভদ্র প্রাসাদ অট্টালিকা তাকে স্থান দেয়নি, এই বস্তিও ফিরিয়ে দেবে তাকে। দিক। সুপ্তিকে নিয়ে বাঁচতেই হবে তাকে।

চলতো দেখি।

ঠিক সে সময় পুলিশ হাতে হাত-কড়া পরিয়ে ঘর থেকে ধরে নিয়ে এল অশেষকে। ঐ তো, পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল পুলিশের গাড়ি। এত সময় লক্ষ্য করে নি নিমেষ। গাড়িতে তুলে নিল অশেষকে। অশেষ ও নিমেষের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হল একবার নয় কয়েকবার। কিন্তু কেউ যেন চেনে না কাউকে। কেউ বল্‌ল না কোন কথা। শুধু গগনভেদী একটা চীৎকার করে উঠল তিলু—

কাকামণি···কাকু···

ছুটে যেতে চায় ওর কাছে। আটকে রাখল নিমেষ।

যাবার সময় পিছু ডাকতে নেইরে তিলু।

কিন্তু কাকামণিকে কেন ধরে নিয়ে গেল ওরা?

তোর কাকামণি চোর। সে চুরি করেছে রে।

চুরি? তাহলে পিসিমণিকে ও তো চুরি করেছে ঐ লোকটা, তাকে ধরল না কেন?

শিশু মনের এ কৌতুহলের, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নেই নিমেষের। তারা চলেছে গাড়িতে করে। সুপ্তিকে গ্রহণ করে সে সার্থক করবে অশেষের বাসনা। চলছে গাড়ি।

গত রাত্রির স্থির অচঞ্চল মন আজ চাঞ্চল্যে বেসামাল হয়ে উঠেছে সুপ্তির। কি করবে সে? ঐ লোকগুলো এসে বলছে দরজা খুলতে। আশা দিচ্ছে পৌঁছে দেবার। কিন্তু দরজা কিছুতেই খুলবে না সুপ্তি। ভেতর থেকে বন্ধ করে রেখেছে খিল।

দরজা পেটাপেটি করে বিলাস চল্‌ল বাড়িতে। বলে গেল বাদলকে—

তুই থাক। বাড়ি পৌঁছে দিস্ ওকে।

নিমেষদের গাড়ি ঢুকছে—তার একটু আগে বেরিয়ে গেল বিলাসের গাড়ি। বাদলের কাছ থেকে জানা গেল কোন্ ঘরে আছে সুপ্তি।

সুপ্তি, সুপ্তি······

চমকে ওঠে সুপ্তি। কার গলা? হ্যাঁ, ঐ তো, সেই প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

সুপ্তি··

না না, সাড়া দেবে না সুপ্তি। কি করে সে দেখাবে তার এমুখ? কি করে আর দাঁড়াবে তার সামনে? আর দাঁড়ালেই বা ওরা কেন ক্ষমা করবে তাকে। জ্বরের সময় বিলাসের ফল দেওয়ার দিনের

কথা ভুলে যায়নি সে আজও। তার দাদা তাকে ক্ষমা করবে না। কিছুতেই না। ঘরময় কি খুঁজতে আরম্ভ করল পাগলের মত। পরক্ষণেই নিরাশ হয়ে পড়ে সে! ঘরে নেই কিছু! শুধু একটা খাট, একটা বিছানা ছাড়া।

স্বপ্তি, স্বপ্তি···

খোঁজে, আবার খোঁজে। না না সে দেখাবে না মুখ। এ জীবন সে রাখবে না আর। খোঁজে! খোঁজে! কিন্তু কি খুঁজছে, কাকে খুঁজছে স্বপ্তি?

স্বপ্তি, দরজা খোল, দরজা খোল স্বপ্তি।

অস্থির হয়ে ওঠে নিমেষ। স্বপ্তি হয়তো বলতে চায়—ফিরে যাও তুমি, ফিরে যাও। দেহ বিলিয়ে দিয়েছি। মন থাকল তোমারই জন্যে। হতে পার তুমি চোর, হতে পার তুমি মাতাল—কিন্তু আমার স্বামী তুমি, পরম গুরু।

স্বপ্তি, খোল দরজা।

ধাক্কা মারছে দরজায়।

পিসিমণি।

কাঁদতে কাঁদতে আকুল হয়ে ডাকে তিলু!

পিসিমণি, পিসিমণি।

তিলুরে, তোর নিষ্পাপ মন নিয়ে কি করে বুঝবি তুই—আমি আর এ মুখ নিয়ে দাঁড়াতে পারি না তোদের সামনে। ফিরে যা তোরা। ফিরিয়ে নিয়ে যা তোর নিমেষ কাকুকে।

স্বপ্তি······

পিসিমণি ··

স্বপ্তি···

পিসিমণি···

দরজা ভাঙ্গছে ওরা। পাগল হয়ে গেল নাকি স্বপ্তি? ছুটোছুটি শুরু করেছে সারা ঘরময়।

সুপ্তি…

পিসিমণি…

বড় একটা প্রকাণ্ড খোলা জানালা। তার ওপর উঠে বসেছে সুপ্তি।

সুপ্তি…

পিসিমণি…

ভাঙলো ভাঙলো দরজা ভাঙল! হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল ওরা।

পিসিমণি…

সুপ্তি…

কিন্তু কোথায় সুপ্তি? কি পড়ল নিচে ঠিক সে সময়।

প্রচণ্ড একটা শব্দ হল শুধু।

ছুটে এল ওরা নিচে।

পিসিমণি, পিসিমণি গো, একি করলে তুমি?

একটা আকাশভেদি আর্ত চীৎকারে ফেটে পড়ল তিলু। মা হারাল সে আবার আজ। নূতন করে।

রক্তাক্ত দেহে মাথা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সুপ্তি।

আস্তে আস্তে ওর মুখখানা কোলের উপর তুলে নিল নিমেষ। কাপড়ের খুঁটে মুছিয়ে দিল তার সমস্ত গ্লানি। জীবন-মরণ সংগ্রামের সব কটি দাগ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বসে থাকল সে ছবির মতন। এই ওর পরিণাম! নারীর প্রেম ওর জন্যে নয়। কিন্তু কৈ, চোখে ত জল নেই নিমেষের? কেন? সব শুকিয়ে গেছে নাকি?

অপলক দৃষ্টিতে সুপ্তির মুখের দিকে তাকিয়ে ও। স্পন্দিত হল চোখ। বার বার কেঁপে উঠল ওর ঠোঁট। কটা কথা বেরিয়ে আসতে চায় ওর মুখ থেকে।

এইতো, চিরকালের মত মৌনতা অবলম্বন করেছে স্বপ্তি। চোর বলে মাতাল বলে ঘেন্নায় মুখ সরিয়ে নেবে না। কোন প্রতিবাদ করবে না আর। মুখের ওপর বলবে না, চোর, তুমি চোর। আমার এমন দাদাকে তুমিই শিখিয়েছ চুরি। তোমাদের চুরির দান আমি গ্রহণ করিনি আর, করবও না কোনদিন।

স্পষ্ট যেন শুনতে পাচ্ছে নিমেষ স্বপ্তির সেই দৃঢ় কণ্ঠস্বর। তার আমরণ প্রতিবাদ। অশেষের পাপ নিমেষের পাপ কারো পাপের অংশ গ্রহণ করে নি স্বপ্তি। তবু জীবন দিয়ে মিটিয়ে গেল সুদে আসলে তাদের পাপের দেনা। করে গেল একটা নির্মম প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু তবু মানতে চায় না নিমেষের কলুষ মন। বারবার ঘুরে ফিরে শুধু মাত্র একটা প্রশ্নই উকিঝুকি মারছে ওর মনে।

কে বড় চোর? যারা পেটের দায়ে প্রয়োজনের তাগিদে চুরি করেছে সেই অশেষ নিমেষ—না প্রাচুর্যের নেশায় যারা ছিনিয়ে নিয়েছে সেই রায়সাহেব বিলাসদের দল?